সূচনা

জীবকের দৃষ্টিতে বুদ্ধ নিয়ে এই কাহিনী।

কাহিনীর সূচনা রাজগীরে। বুদ্ধের পদানুসরণ করতে করতে কাহিনীটি ধীরে ধীরে রূপ পায়। যে সব গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে প্রধান হোল রিস ডেভিডস্ ও রকহিলের রচনাবলী; অমূল্য চন্দ্র সেনের বুদ্ধকথা এবং রাজগৃহ ও নালন্দা; রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব; অবনীন্দ্রনাথের নালক; সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের বুদ্ধজীবনী, সুকুমার দত্ত অনূদিত মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত; রামপ্রসাদ সেনের ধম্মপদ; ঈশান চন্দ্র ঘোষের জাতকমঞ্জরী; ভিক্ষু শীলভদ্রের দীঘানিকায়; বিজয় চন্দ্র মজুমদারের থেরী গাথা; বিমলাচরণ লাহার বৌদ্ধযুগের ভূগোল ও ডঃ আশা দাসের বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পালি অধ্যাপক ও এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো, ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত, নানা তথ্য জানিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থ প্রকাশনে সাহায্য করেছেন বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা মীরা ভট্টাচার্য।

গ্রন্থটি লিখতে ভাল লেগেছে। পাঠকের মনেও যদি তা সঞ্চার করতে পারি তবে ধন্য হবো। মনে রাখতে হবে এ কাহিনী কাম ক্রোধ লোভ মোহের কাহিনী নয়। ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয় লোকে যাবার অভীপ্সা।

দীপ্তি ত্রিপাঠী

হে অনন্তপুণ্য

হে অনন্তপুণ্য

তক্ষশিলায় ভোর হচ্ছে।

গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা। উত্তরাখণ্ডের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এই তক্ষশিলা। আঠারোটি বিদ্যার চর্চাক্ষেত্র।

মনোরম স্থান—বন, উপবন, সরোবর। গ্রন্থাগার, আচার্যদের গৃহ, স্নাতকার্থীদের আবাস—সব সাজানো।

চন্দ্র সরোবরের শীতল জলে স্নান সেরে শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উত্তরীয় পরে নিলেন জীবক। শয্যাপার্শ্বে প্রদীপের নিবু নিবু শিখা নিদ্রাহীন পাঠের সাক্ষী।

আজ জীবকের পরীক্ষা। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই দিনটির জন্যই তো প্রস্তুতি। ফুঁ দিয়ে দীপ নিবিয়ে দেবার আগে কক্ষের চারদিকে একবার দেখে নিলেন তিনি।

মনে পড়লো প্রথম দিনটির কথা। যেদিন তিনি এসেছিলেন ষোল বছরের কিশোর। আজ তেইশ বছরের যুবক। তক্ষশিলার স্নাতক হতে চলেছেন। হতে চলেছেন "ভিষগরত্ন"। তক্ষশিলার আর এক বিখ্যাত ছাত্র পাণিনির মত তাঁকেও কালের বক্ষে আঁচড় টানতে হবে।

রাজগৃহের অনাথ বালক জীবক। কে তাঁর পিতা? কে তাঁর মাতা? কেউ জানে না। তিনি শুধু চেনেন তাঁর পালক পিতা কুমার অভয়কে। আসবার সময় অভয় বলেছিলেন—"জীবক,

আত্মশক্তি জাগাও। উপার্জনক্ষম হও। দেখ, আমি রাজপুত্র হয়েও যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেছি। রথ তৈরি করে উপার্জন করি।”

সত্যি, কুমার অভয় কত রকমের রথই না তৈরী করেছেন।

কোনটি দ্বিচক্র, কোনটি চারচক্র, কোনটি আটচক্র, আবার কোনটি বা ষোল চক্র। কোনটি একতল, কোনটি দ্বিতল, কোনটি বা ত্রিতল।

বণিকেরা এক-ঘোড়া-টানা একতল বেগবান রথ পছন্দ করতেন। যুদ্ধের রথ হোত আরো দ্রুতগামী। নানা দিকে তাকে ঘোরানো যেতো—দরকার হলে উল্লম্ফনও করানো যেতো।

রাজাদের রথ হোত সুবৃহৎ, কারুকার্যময়। রাজা বিম্বিসারের জন্য তৈরী হয়েছিল সাতটি সাদা ঘোড়ায় টানা এক শ্বেতবর্ণ রথ। যেন শরতের শুভ্র মেঘখণ্ড। উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের জন্য তৈরী হয়েছিল ষোলটি কালো ঘোড়ায় টানা সোনার রথ। যখন চলতো মনে হোত কালো মেঘের কোলে সোনালী বিদ্যুতের ঝলক।

বৎসরাজ উদয়নের জন্য তৈরী হয়েছিল ষোল চাকার রথ। দুর্লভ তার কারুকার্য।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের ছিল সুবৃহৎ ত্রিতল রথ। তিনি রানী, মন্ত্রী, পরিজনবর্গ সকলকে নিয়ে বেড়াতে ভালবাসতেন। তাছাড়া সাকেত, বিদেহ, চম্পা, বারাণসী প্রভৃতি স্থান থেকেও অভয়ের কাছে যে কত রথের দাবী আসতো তার ঠিক নেই। প্রায় দুইশত কুশলকর্মী দিবারাত্র পরিশ্রম করেও কাজ শেষ হোত না।

অভয় তাই জীবককে বলেছিলেন—“বিদ্যা শেখ। বিদ্যাই অস্ত্র।”

তাই না সাত বছর ধরে জীবক অহোরাত্র বিদ্যার চর্চা করেছেন। পড়েছেন পঞ্চম বেদ—আয়ুর্বেদ। দিনের পর দিন বনে বনে ঘুরে চিনেছেন ওষধি। শুধু মুখস্থ নয়—অন্তঃস্থ করেছেন সৌর

সংহিতা, সোম সংহিতা, অশ্বিনী সংহিতা। আয়ত্ত করেছেন ত্রিধাতুর যা ভিত্তি, আয়ুর্বেদের যা ভিত্তি।

দুয়ার খুলে তিনি বাইরে এলেন। এখন শীতের শেষ—বসন্তের শুরু। আকাশে এখনো কুয়াশার হালকা আবরণ। পথে ঝরছে বিন্দু বিন্দু শিশির। দিকচক্রবালে উষার সোনার বিন্দু। সূর্য উঠছে। জীবক সূর্য-প্রণাম করলেন।

জীবক এলেন গুরু সকাশে। আচার্য আত্রেয় চিকিৎসা শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। দেশ-বিদেশের ছাত্র আসে তাঁর কাছে মহার্ঘ উপহার নিয়ে। প্রণামী দেয় প্রচুর অর্থ। জীবক নিঃস্ব। তবু গুরু জীবককে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মেধা দেখে।

আত্রেয় পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার জীবকের দিকে তাকালেন। উন্নত নাসা, আয়ত চক্ষু, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশস্ত কপাল। শুভ্র বস্ত্র শুভ্র উত্তরীয়ে আবৃত দেহ, যেন প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য।

আত্রেয় জীবকের হাতে একটি কুঠার তুলে দিয়ে বললেন—"বৎস, সম্মুখের কুঞ্জলবনে যাও। একটি উদ্ভিদ তুলে আনো, যা, দিয়ে কোন ওষধি তৈরী হয় না।"

জীবক এক প্রহর ধরে কুঞ্জলবনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরলেন কিন্তু গুরুর প্রার্থিত একটি উদ্ভিদও দেখতে পেলেন না। তিনি বৃক্ষের মধ্যে দেখলেন অর্জুন, ধাত্রী, জম্বু, হরিতকী, বিল্ব, খর্জুর, নিম্ব : পাতার মধ্যে দেখলেন তুলসী, ত্বাষ্টী, সুনিষণ্ণক; ঘাসের মধ্যে দূর্বা, মুথা, কুশ; মূলের মধ্যে সুকন্দক, রসোনা, আর্দ্রক, হরিদ্রা। অর্থাৎ উদ্ভিদের পত্র, পুষ্প, ফল, শাঁস, বীজ, ত্বক কোন না কোন কাজে লাগে। একটি উদ্ভিদ নেই যা মানুষের কাজে লাগে না।

জীবক তাই ফিরলেন শূন্যহাতে। গুরুকে কুঠার দিয়ে বললেন—"গুরুদেব, আপনার প্রার্থিত কোন উদ্ভিদ পেলাম না যা মানুষের কাজে লাগে না।"

আচার্য আত্রেয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—“উত্তম।”

শল্য চিকিৎসক বরুণ দত্ত ও আচার্য মিহির বললেন—“সাধু, সাধু।”

এবার শল্য পরীক্ষা। শল্যাগারে প্রবেশ করলেন জীবক। একটি কিশোরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বরুণ দত্ত। একটি পা তার হাঁটু পর্যন্ত ফুলে গেছে। বরুণ দত্ত পা-টি কাটতে চান। আচার্য মিহির এতে অসম্মত। বললেন—“পা কাটলে লোকটা খাবে কি? লোকটির জীবিকা কাঠ কাটা। জীবক, তুমি কি বলো?”

জীবক কিছু না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে পা-টি পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর ছোট একটি চিমটে দিয়ে গোড়ালির কাছ থেকে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা টেনে বার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নালা দিয়ে যেমন জল বয়ে যায় তেমনি রক্ত ও পুঁজ ঝরতে লাগলো। জীবক পায়ের ফোলা অংশ চেপে ধরলেন। আরো রক্ত, আরো পুঁজ। একটু পরে ফোলা কমে গেল। জীবক তখন কর্পূরজলে তা ধৌত করে, রক্তচন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে, শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে ক্ষত বেঁধে দিলেন। বিদ্যার্থী ছাত্ররা বিস্মিত। আত্রেয়ের আনন্দের অবধি নেই। জীবক একজন বিদ্যার্থীকে বললেন—“একে একটু উষ্ণ দুগ্ধ পান করাও। দু' তিন দিন শুয়ে থাক্। তারপর ভাল হয়ে যাবে।”

আচার্য মিহির বললেন—“আশ্চর্য! একটি বেলকাঁটা এত কাণ্ড করেছে। এটা তো দেখিনি!” আচার্য বরুণ দত্ত একটু অপ্রতিভ। তিনি প্রবীণ চিকিৎসক—তাঁর এটি লক্ষ্য করা উচিত ছিল।

আচার্য আত্রেয় উল্লসিত। তাঁর শিষ্য সব পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তিনি পরম স্নেহে জীবকের অঙ্গে পরিয়ে দিলেন স্নাতক-চিহ্ন—হরিদ্রাবর্ণ উত্তরীয়। হেসে বললেন—“তুমি তো ভিষগরত্ন

হে।” আচার্য বরুণ দিলেন কোমরে ঝোলাবার জন্য একটি চামড়ার থলি। তাতে আছে ছোট চিমটে, ছোট ছুরি, ছোট নরুণ, ঘোড়ার ল্যাজ দিয়ে তৈরী শক্ত সুতো, সূঁচ, ছোট কাঁচি। আচার্য মিহির দিলেন একটি মূল্যবান গ্রন্থ—‘ভেষজ পঞ্জিকা’।

জীবক আচার্যদের প্রণাম করে বিদায় নিলেন। এসে দাঁড়ালেন রাজপথে। এই সেই পথ যা তক্ষশিলা থেকে চলে গেছে হস্তিনাপুর, সাকেত, বারাণসী হয়ে রাজগৃহে। জীবক রাজগৃহের পথ ধরলেন। সেখানে যে অপেক্ষা করে আছেন তাঁর পালক পিতা কুমার অমাত্য অভয়। ঐ একটি স্নেহের বন্ধন আজো অক্ষয়। নইলে জীবকের আর কে আছে? তাঁর জন্ম ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত। একটি সিন্দুকের মধ্যে নাকি তাঁকে পাওয়া যায়। রাজা বিম্বিসার প্রশ্ন করেন—“শিশু কি জীবিত?”

কুমার অভয় বলেন—“জীবিত।”

তাই নাম ‘জীবক’। অদৃশ্য নিয়তি সেদিন নিশ্চয় প্রসন্ন হাসি হেসেছিল এই নামকরণে। পরবর্তীকালে যে বহু লোকের জীবন দান করবে তারই তো নাম হওয়া উচিত জীবক। জীবন দাতা।

বিম্বিসার বললেন অভয়কে—“তুমি এই সুলক্ষণ শিশুটির লালন-পালনের ভার নাও।”

কুমার অভয় বললেন—“যথা আজ্ঞা।”

* * *

সাকেত নগরে পৌঁছে জীবকের সব অর্থ ফুরিয়ে গেলো। এখন উপায়? বিশ্রামশালার অধ্যক্ষ বললেন—“আপনি ভিষক। আপনার আবার অর্থের অভাব? এই তো সম্মুখের বাড়িতেই থাকেন বৈদূর্য শ্রেষ্ঠী। তাঁর স্ত্রীর তিন মাস ধরে মাথাব্যথা। কেউ সারাতে পারছে না। উনি ঘোষণা করেছেন, যে সারাতে পারবে তাকে তিনশত স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। কত বৈদ্য এলো গেলো,

কেউ সারাতে পারছে না। যান না, মহাশয়, সারালে এখুনি তিনশত স্বর্ণমুদ্রা পাবেন।"

জীবক তখুনি গেলেন শ্রেষ্ঠী-ভবনে। মর্মর প্রস্তরে নির্মিত সুবৃহৎ প্রাসাদ। উদ্যানে ফোয়ারা—হীরকের কুচির মত জল ঝরছে, জ্বলছে। ঝিলে হাঁস। উপবনে ময়ূর। গলায় সোনার কাঠি, হাতে রূপোর তাগা পরা দাসী এসে জীবককে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলো। পালঙ্কে শুয়ে আছেন শ্রেষ্ঠীপত্নী—রূপসী কিন্তু অসুস্থতার জন্য পাণ্ডুবর্ণ। মাথায় একটি দাঁড় বেঁধে শুয়ে আছেন। জীবক দেখা মাত্রই বুঝলেন, মাথায় সর্দি জমেছে। তিনি শ্রেষ্ঠীপত্নীকে নাক দিয়ে পুরনো ঘি টেনে নিয়ে গলা দিয়ে ফেলে দিতে বললেন। এরকম তিন বার করার পর মাথা ধরা অনেকটা কমে গেল। শ্রেষ্ঠীপত্নী একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। দাসীকে ঐ কফ মিশ্রিত ঘৃত একটি পাত্রে তুলে রাখতে নির্দেশ দিলেন। জীবক বিস্মিত। মহিলাটি এত কৃপণ! তবে কি তিনি তাঁর শ্রমের মূল্য পাবেন? পাবেন তাঁর ওষধিরও দাম?

কি আশ্চর্য! শ্রেষ্ঠীপত্নী কিন্তু জীবকের মনের ভাব বুঝতে পারলেন, বললেন—

"ভিষগরত্ন, আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার প্রাপ্য আপনি পাবেন। আমরা তো গৃহী—সঞ্চয় আমাদের ধর্ম। এই ঘৃত মহার্ঘ। একে ফেলে দেওয়া চলে না। এ দিয়ে দীপ জ্বালানো যেতে পারে। দাসীদের পায়ের ব্যথায় মালিশের কাজে লাগতে পারে। এতটা ঘি তো ফেলে দিতে পারি না।"

জীবক যুক্তি মেনে নিলেন। কালোজিরের চূর্ণ ও ঘি মেশালেন। তাতে দিলেন বাসক, মধু ও আদা। পঞ্চাশটি বটিকা তৈরী করে শ্রেষ্ঠীপত্নীকে দিলেন। বললেন—"মা, ঈষদুষ্ণ দুধ দিয়ে প্রতিদিন একটি করে বটিকা খাবেন। এ রোগ আর হবে না।"

শ্রেষ্ঠীপত্নী জীবকের হাতে তুলে দিলেন তিনশত স্বর্ণমুদ্রা—যা

আশাতীত। জীবক পুনরায় বিস্মিত। এই নারীর কাছে তাঁর অনেক শিক্ষা হলো।

বিশ্রামশালায় ফিরে এলেন। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। অধ্যক্ষ বললেন—"আপনি তো রাজগৃহে যাবেন ? রত্নশ্রেষ্ঠী যাচ্ছেন—তাঁর সঙ্গ নিন। পথখরচও লাগবে না। তিনিও সুযোগ্য সঙ্গী পাবেন।"

জীবক বুঝলেন তাঁর চিকিৎসার সাফল্যের সংবাদ সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

রত্নশ্রেষ্ঠী এগিয়ে এসে প্রতিনমস্কার করলেন। বললেন—"চলুন, রথে যেতে যেতে পরিচয় হবে। এখুনি যাত্রা করলে, তিন দিনেই রাজগৃহ পৌঁছবো।"

যাত্রা শুরু হলো। পথের দুপাশে কত রংয়ের ফুল—রঙীন প্রজাপতি, সোনালি মৌমাছি। পাখিরা গান গাইছে। বসন্তের সূর্যে মধুর উত্তাপ।

জীবক মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন।

* * *

পাটলী গ্রাম থেকেই দেখা গেল বহু লোক পুষ্প, গন্ধ, মাল্য নিয়ে চলেছে রাজগৃহে। রাজপথে কিসের যেন একটা উল্লাস। আজ যেন কিসের এক অনুষ্ঠান। জীবক প্রশ্ন করলেন—"এরা কোথায় চলেছে ? আজ কি ইন্দ্রপূজো ?"

রত্নশ্রেষ্ঠী বললিন—"শোনেন নি ? আপনাদের রাজা বিম্বিসার সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আহ্বান করে এনেছেন রাজগৃহে।"

"না, শুনি নি। সাত বছর……। দীর্ঘ সাত বছর আমি কি আমাতে ছিলাম ! অহোরাত্র পড়েছি আয়ুর্বেদ। দীর্ঘ দিবসগুলি কেটেছে বনে বনে—চিনেছি বনৌষধী। দিন রাত কোথা দিয়ে কেটেছে তার খবরই রাখতাম না।"

রত্নশ্রেষ্ঠী জীবককে বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিলেন। এবার সমীহের সঙ্গে বললেন—"তবে শুনুন। সম্যক সম্বুদ্ধ এক

আশ্চর্য সাধু। তিনি বক্রকে ঋজু করেন। অসরলকে সরল করেন। কুটিলকে সহজ করেন। লঘুকে গম্ভীর করেন।

তিনি হ্রদের মতো স্বচ্ছ। পর্বতের মতো দৃঢ়। সমুদ্রের মতো গভীর। আকাশের মত উদার। সূর্যের মত উজ্জ্বল। চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ।

তিনি কি বলেন শুনুন, তাঁর দু চারটি পদ শোনাই—

"মন চলে সদা মনের আগেতে মনোজিত সব ধর্ম।
মন্দ মনেতে যে করে ভাষণ অথবা মন্দ কর্ম,
দুঃখ যে তার নিত্যসঙ্গী নিশিদিন রহে কাছে
অবিরত যথা শকট-চক্র ঘোরে বলদের পাছে।"

কিন্তু সৎকর্ম যে করে তার কি হয়?

"প্রসন্ন মনে যে করে ভাষণ, প্রসন্ন মনে কর্ম,
সুখ তার হয় নিত্য সঙ্গী—সাথে থাকে দিবারাত্রি
ছায়া যথা ফিরে কায়ার পিছনে বিচ্ছেদহীন যাত্রী।"

জীবক বললেন—"চমৎকার।"

"আরো কত চমৎকার কথা যে বলেন। মনে হয় সব ছেড়ে ভিক্ষু হয়ে যায় যাই। কিন্তু তথাগত বলেন—"গৃহধর্মও ধর্ম। সংসারও দ্বিতীয় আশ্রম। তোমরা গৃহী—পঞ্চশীল পালন কর।"

"সে আবার কি?" জীবক বিমূঢ় হয়ে বললেন।

রত্নশ্রেষ্ঠী হাতের কড় গুণে গুণে বললেন"—"অহিংসা, অদত্ত গ্রহণ না করা, অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবা না করা, অসত্য না বলা এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার না করা।"

জীবক আবার বললেন—"চমৎকার।"

রত্নশ্রেষ্ঠী বললেন—"আপনি যদি তাঁর কাছে একবার যান তো ফিরতেই পারবেন না। তাঁর শিষ্য হতেই হবে। ঐ তো বেণুবন-বিহার শীর্ষ দেখা যাচ্ছে। কাল সকালে এসে শুনবেন—মনে হবে অমৃত পান করছেন।"

সম্মুখে অপূর্ব নগরী রাজগৃহ। তাকে বেষ্টন করে আছে বিন্ধ্যের প্রত্যন্ত গিরিমালা—বিপুল, বৈভার, ঋষিগিরি, গৃধ্রকূট, পাণ্ড্যগিরি। নগরীতে ঢুকতেই দেখা যাবে তপোদা নামে উষ্ণ প্রস্রবণ। তার তীরে রাজার কাননগৃহ—তপোদারাম। উত্তরের পথটি চলে গেছে নালন্দা, পাটলীগ্রাম ও বৈশালীতে। পূর্বপথটি গেছে অঙ্গদেশে, যার রাজধানী চম্পা। উত্তর ভারতের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র এই রাজগৃহ। পুষ্পশোভিত বহু অট্টালিকা, প্রাসাদ মণ্ডিত প্রশস্ত রাজপথ। মেলা, উৎসব, অনুষ্ঠান এই নগরে লেগেই আছে।

এই সুদৃশ্য ভূখণ্ডের রাজা বিম্বিসার। রাজা ভট্টিয় মহাপদ্ম ও রানী বিম্বির পুত্র, হর্যংক বংশীয় শ্রেণিক বিম্বিসার বহুগুণে গুণবান্। তাই তো তাঁর নাম শ্রেণিক। অঙ্গ রাজ্য জয় করে তিনি পিতা বর্তমানেই হয়েছিলেন অঙ্গের উপরাজা। হস্তী, অশ্ব, রথ চালনায় সুদক্ষ ছিলেন। কূট-নীতিতে ছিলেন নিপুণ। পত্র মৈত্রী ছিল তাঁর অরিষ্টনেমির পুত্র উজ্জয়িনীরাজ চণ্ড প্রদ্যোতের সঙ্গে, গান্ধার রাজের সঙ্গে। বিবাহ সূত্রে মৈত্রী বন্ধনে বেঁধেছিলেন কোশল, বৈশালী ও মদ্রকে। রাজগৃহকে সমৃদ্ধির শীর্ষে তুলেছেন তিনি। কত দিনের এই নগর—কত এর নাম। রামায়ণের যুগে এই তো ছিল কেকয়। মহাভারতের যুগে জরাসন্ধপুরী—গিরিব্রজ বা গিরিঅগ্র (গিরিআক)। কোন সময়ে এর নাম ছিল বৃহদ্রথপুর, কখনো বসুমতী; খুব ভাল কুশতৃণ হোত বলে নাম ছিল কুশাগ্রপুর, কেউ বা বলত বৃষভপুর। এখন তা বিম্বিসার পুরী—রাজগৃহ।

রত্নশ্রেষ্ঠীর রথ রাজগৃহে যখন প্রবেশ করল তখন সন্ধ্যা নামছে। রাজপথে আলোকমালা। বিপণিতে বিপণিতে নাগরিকদের ভিড়। রথ এসে পেঁছিল গৃহদ্বারে। শ্রেষ্ঠীকে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে জীবক বহির্দ্বারে ঘা দিলেন।

দূর থেকে শোনা যাচ্ছে বেণুবনবিহারে সন্ধ্যার মন্ত্র—

“ইহ মোদতি, পেচ্চ মোদতি,

কত পুঞ্ঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি :

সো মোদতি, সো পমোদতি,

দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো।”

একটু দূরে নটিমুখ্যা শালবতীর ভবন। সেখানে বীণায় বাজছে রাগ বসন্ত। মৃদু পবনে ভেসে আসছে রাজোদ্যানের পুষ্পসুরভি—টগর চাঁপার গন্ধ। জীবক জোর করে শালবতীর গৃহ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। লোকে বলে ইনি তাঁর মা। হবে। একটা তীব্র বেদনা বিদ্ধ করলে তাঁকে। অভিমান? অপমান? লজ্জা? নাকি মাতৃস্নেহ বঞ্চিতের দুঃখ? নাকি জ্বালা? লোকের কণ্ঠে পরিহাসের সুর—‘নটিপুত্র’।······

অথচ এই শালবতী ভিন্ন রাজগৃহ নগরী হোত না, যেমন আম্রপালি না হলে বৈশালী নগরী হোত না, অর্ধকাশী না হলে বারাণসী নগরী হোত না। আম্রপালি যেমন বিশাল আম্র-কাননের অধীশ্বরী, অর্ধকাশী যেমন অর্ধেক কাশীর ভূসম্পত্তির অধীশ্বরী, শালবতী তেমনি বিশাল মহাশালবনের অধীশ্বরী। তদুপরি নৃত্যে গীতে বাদ্যে তাঁর মত পারদর্শিনী বিরল। তবু পরিহাস—‘নটিপুত্র’।······

দুয়ার খুলে গেল। জীবক দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে পুরাতন ভৃত্য শার্দুল—তার হাতে প্রদীপ। ছেলেবেলা থেকে তাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছে এই শার্দুল। যদিও তাঁর ক্ষীরধাত্রী ছিল শার্দুলের স্ত্রী উদুম্বরিকা, কিন্তু ক্রীড়াসঙ্গী, অঙ্গসংবাহক, সবই ছিল শার্দুল। প্রদীপের মৃদু আলোতে জীবকের মনে হলো শার্দুলের পশ্চাতে একটি সুন্দরী কিশোরী মূর্তি।

শার্দুল প্রথমটা ঠাহর পায়নি। এবার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো—“কুমার ভৃত্য!”

সঙ্গে সঙ্গে সোপানের নারী মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আলো আঁধারের মধ্যেও জীবকের মনে হলো মেয়েটি অসামান্যা সুন্দরী। সুবর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরণ করে চলে গেলো। কে এই সুন্দরী? শার্দুল ততক্ষণে হাতে নিয়েছে জীবকের পেটিকা, মুখে তার কথার বিরাম নেই।

"চলো, চলো। তোমার জন্য কুমারঅমাত্য দিনের পর দিন গুণছেন। এদিকে আচার্য আত্রেয় লিখেছেন—তুমি মাসাধিক কাল তক্ষশিলা ছেড়ে গেছ, অথচ তোমার কোন সংবাদ নেই। কি করি? কোথায় যাই? রাজপথে গিয়ে বসে থাকি। শ্রেষ্ঠী দেখলেই শুধাই। তারা বলে—তোমার জীবককে তো পথে দেখি নি। শুনে কুমারঅমাত্যের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়ে। কি যে ব্যাধি হয়েছে, শরীর একেবারে কাঠি। কত বৈদ্য এলো গেলো—কিছুই হলো না। এখন দেখি তোমার হাত-যশ।" শার্দুল হা হা করে হাসল। তারপর সোপানে কয়েক পদক্ষেপ উঠে নীচু গলায় বলল—"সাবধানে কথা বলবে। বধূরানী আছেন।"

জীবকও নিচু সুরে শুধালেন—"বধূরানী কে?"

শার্দুল ফিসফিস করে বলল—"কুমারঅমাত্যের পত্নী। তুমি চলে গেলে কুমারঅমাত্য যদৃচ্ছাচার শুরু করলেন। পাত্রের পর পাত্র কোহল খাচ্ছেন। নয় শালবতীর ভবনে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন। শেষে বেশ জোরালো অসুখ ধরলো। মহারাজ খুব চিন্তিত হলেন। জানেন তো, কুমারকে তিনি খুব ভালবাসেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম সন্তান। আর কি গুণবান্! রথ বানাতে পারেন; অস্ত্র তৈরী করতে পারেন; বীণা বাজাতে পারেন। কূটনীতিতে বিশারদ। ধীর স্থির। এই যে মহারাজ ওকে যৌবরাজ্য না দিয়ে বৈদেহীপুত্রকে যৌবরাজ্য দিলেন, তাতে ওঁর একটুও রাগ নেই। বরং হেসে হেসে তাঁকে রাজকার্য শেখান। বলেন—'আমার ছোট ভাই—সে রাজা হলেই আমারও রাজার হওয়া

হলো।' মহারাজকে উনিও খুব ভালবাসেন। সব রাজকার্যে সাহায্য করেন। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তো যুদ্ধ বেঁধে উঠেছিল। তখন উনি ওঁর ধর্ম-মা উজ্জয়িনীর নটিমুখ্যা পদ্মাবতীকে দিয়ে চণ্ড-প্রদ্যোতের ক্রোধ কমালেন। সে এক দুর্জয় কূটবুদ্ধি।

মন্ত্রীরা তো অবাক। তারা তো ভেবেছিল এই যুদ্ধ হয় হয়। তাহলে তাদের মজা। কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা অর্জন হবে। কিন্তু কুমারঅমাত্য সবাইকে একটি পত্রে থ করে দিলেন। এমন নিঃস্বার্থ দেশসেবা কে করতে পারে বল?"

"তুমি যে বধূরানীর কথা বলছিলে?"

"সেই তো অসুখ হলো। মহারাজা চিন্তিত, কি করেন? বৈশালীতে খবর পাঠালেন। জানেন তো সেখানের নটিমুখ্যা আম্রপালি ওঁর মা। তিনি শুনে বধূরানীকে পাঠালেন সেবার জন্য।"

কথাটা জীবকও শুনেছিলেন। বৈশলীর নায়ক সকলের দুই ছেলে—গোপাল ও সিংহ। সকল ছিলেন চতুর ব্যক্তি। সিংহকে তিনি নায়ক করেন। এই সিংহের মেয়ে বৈদেহীর সঙ্গে বিয়ে দেন রাজা বিম্বিসারের। সেই সূত্রে বড় ছেলে গোপাল হন বিম্বিসারের মহামাত্য। ছেলে হলো প্রধান মন্ত্রী: নাতনী হলো অগ্রমহিষী। কিন্তু বিবাহ করতে গিয়ে বিম্বিসার দেখলেন বধূ পাঁচ বছরের বালিকা। চতুর সকল রাজার মনোভাব বুঝে নটিমুখ্যা আম্রপালির গৃহে রাজার জন্য সপ্তাহব্যাপী প্রমোদের আয়োজন করলেন। এই পটভূমিতে কুমার অভয়ের জন্ম। আম্রপালি বৈশালীর নটি মুখ্যা। তাঁর গৃহে বেশীদিন শিশুকে রাখা চলে না। মহারানী বৈদেহী যখন দ্বিতীয় বিবাহের পর মগধে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে দাসদাসী হস্তী, অশ্ব এলো। সেই সঙ্গে কুমার অভয়ও এলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র পাঁচ। এসেই তিনি অকুতোভয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট বিম্বিসারের অঙ্কে আরোহণ করেন। পুলকিত রাজা তাই তার

নাম দিলেন 'অভয়'। এত মিষ্ট স্বভাব ছিল তাঁর যে মহারানী বৈদেহীও তাঁকে পুত্রবৎ ভালবাসতেন। অজাতশত্রু তো হলেন বছর দশেক পরে। অতএব বহুদিন অভয়ই ছিলেন বিম্বিসারের একমাত্র পুত্র। রাজা বিম্বিসারের সবশুদ্ধ আটটি পুত্র হয়েছিল। কিন্তু তারা সকলেই এদের কনিষ্ঠ। যেমন রানী বেল্লানার পুত্র হল্ল, বেহল্ল, কাল। উজ্জয়িনীর নটিমুখ্যা পদ্মাবতীর পুত্র বিমল কৌণ্ডিন্য। রানী কোশলদেবীর পুত্র শীলবৎ, জয়সেন।

কথা বলতে বলতে দুজনে কুমার অমাত্যের কক্ষে এলেন। মৃদু প্রদীপের আলোয় জীবক দেখলেন, পালঙ্কে অভয় বসে আছেন। কুমারবধূ ময়ূর পাখা দিয়ে তাঁকে বীজন করছেন। জীবক গাঢ়স্বরে বললেন—"পিতা!"

অভয় দুহাত বাড়িয়ে আকুলকণ্ঠে বললেন—"বৎস।" উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরলেন। কতদিন পরে দেখা। দীর্ঘ সাত বছর। অর্ধযুগেরও বেশী।

জীবক আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বললেন—"পিতা, দেখুন আপনার জন্য কি এনেছি।" সেই তিনশত স্বর্ণমুদ্রা—যা সাকেতের শ্রেষ্ঠী-পত্নী তাঁকে দিয়েছিলেন—যা তাঁর জীবনের প্রথম উপার্জন—তা তিনি কুমার অমাত্যের চরণে রাখলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! জীবক অবাক হয়ে দেখলেন অভয় কেমন পা সংকুচিত করলেন। জীবকের হাতে মুদ্রাগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—"অনিচ্চ (অনিত্য), অনিচ্চ, অনিচ্চ।

"জীবক, এ তোমারই থাক। অর্থ আমার দরকার নেই। শুধু একটি কথা দাও, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমার গৃহে থাকলে তোমার ব্যবসার সুবিধেই হবে। আমার কর্মশালায় বহু রাজা, শ্রেষ্ঠী, বণিক আসেন। তাঁরা তোমার কাছেও আসবেন। এ ভিন্ন রাজাকে বলে আমি তোমাকে মগধের রাজবৈদ্য করেছি।" বধূকে বললেন—"সোমপ্রভা, দাও তো সেই ভূর্জপত্রটি।"

কুমারবধূ উঠে পেটিকা থেকে পত্রটি আনলেন। নিয়োগপত্র জীবকের হাতে দিয়ে অভয় বললেন—"কাল প্রভাতেই তুমি রাজসভায় যাবে।"

জীবক ততক্ষণে পিতার নাড়ী পরীক্ষা করে খলে ওষুধ মাড়তে শুরু করেছেন। অর্জুন গাছের ছাল এবং নিম্বমধু, তার সঙ্গে সুন্নিষণ্নক শাকের কয়েক ফোঁটা রস মিশিয়ে, নিজ হাতে ঝিনুক দিয়ে কুমারকে খাইয়ে দিলেন। এবার অনুপান। শার্দুলকে বললেন—"একটু উষ্ণ দুধ।" শার্দুল কিছু করার পূর্বে কুমারবধূ দুগ্ধ আনলেন। পিতাকে দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়ে দিয়ে তাঁকে একটু সুস্থ করে তুললেন। অভয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—"আচার্য আত্রেয় লিখেছেন, তুমি 'ভিষগরত্ন' হয়েছ। আমার তো মনে হয় তুমি কাছে থাকলেই আমি ভাল হয়ে যাব। ওষধির দরকার হবে না।"

শার্দুল বলল—"একথা ঠিক বলেছেন কুমারামাত্য। এ ক'দিন শয্যায় পাশ ফিরতে পারতেন না। আজ কুমারভৃত্য আসায় কেমন উঠে বসে আছেন, দেখ।"

জীবক মৃদু হাসলেন। ঘোমটার অন্তরালে সোমপ্রভাও মৃদু হাসলেন। আর অভয় তো হো হো করে হেসে উঠলেন। একটি আনন্দের মুহূর্ত। জীবনে তো সব সময় আসে না। কিন্তু যখন আসে? তখন সেই তো স্বর্গ। জীবক তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে নিলেন। আত্মপ্রশংসা শুনতে তাঁর ভাল লাগে না। কথার গতি ঘোরাবার জন্য বললেন—"এখানে নাকি এক আশ্চর্য শ্রমণ এসেছেন?"

অভয় সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন —"এসেছেন। শ্রমণ গৌতম। ভগবান বুদ্ধ।"

"বুদ্ধ! সেকি প্রত্যক্ষ হয়?"

"হয়। হয়েছে। রাজা বিম্বিসারের পুণ্যে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে।

'মানব জন্ম দুর্লভ অতি—জীবনরক্ষা যুদ্ধ, সত্যধর্ম শ্রবণ কঠিন—অতি দুর্লভ বুদ্ধ।' সুলগ্নে ফিরেছ, জীবক। কালই তুমি তাঁকে দেখো। সূর্যের আলোর মত তাঁর উপদেশ মনের সব সংশয় কুয়াশা সরিয়ে দেয়। তাঁর কথা শুনেই বুঝেছি সত্য কি!"

জীবক শুধালেন—"শ্রমণের পূর্ব পরিচয় কি?"

অভয় হাসলেন—"তথাগতের পূর্ব পরিচয় লাগে না। জন্ম জন্ম ধরেই তো তিনি বোধির চর্চা করে আসছেন।"

"আমি এজন্মের কথা জানতে চাইছি।"

"এ জন্মে তিনি কপিলবাস্তুর রাজা সিংহহনুর পুত্র রাজা শুদ্ধোদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মা মায়াদেবী দেবদহের রাজকন্যা। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম সর্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। তখন ওঁর মাসী শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া মহিষী মহামায়া বা মহাপ্রজাবতী ওঁকে পুত্রস্নেহে পালন করেন। বিবাহ হয় সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরার সঙ্গে। একটি পুত্র হয়, নাম রাহুল।

পথে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। ঠিক করলেন, মানুষের দুঃখমোচনের জন্য তিনি বুদ্ধ হবেন। রাজপ্রাসাদের সোনার খাঁচা তাঁকে বাঁধতে পারলো না। বিশ্বভুবন দুঃখের তাপে জ্বলছে। তাঁর মনে কেবলই বাজতে লাগলো দুঃখ জয় করতেই হবে।

আনন্দ? সে তো শরতের মেঘের মত মিলিয়ে যায়। সুখ? সে তো বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী। জীবন? সে তো জলবুদবুদের মত ক্ষণিক। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জানবার জন্য তিনি রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ত্যাগ করে যৌবনে যোগী হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ঊনত্রিশ বছর।" মহাভিনিষ্ক্রমনের দিনটি ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

"তারপর?"—জীবক সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

"এলেন বৈশালী। সেখানে ব্রাহ্মণ আড়ার কালামের কাছে শিখলেন ধ্যান। কিন্তু শান্তি পেলেন না। বৈশালী নির্গ্রন্থিদের কেন্দ্র। গেলেন তাদের কাছে। কিন্তু যা খুঁজছেন তা মিললো না। এলেন শ্রাবস্তী, রুদ্রক রামপুত্রের কাছে। এঁর কাছেও শিখলেন ধ্যানের কিছু প্রক্রিয়া। কিন্তু দুঃখ জয়ের মন্ত্র কোথায়?

দুঃখ কি? দুঃখের কারণ কি? দুঃখ নিবৃত্তি, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি? এই চারটি আর্য সত্য তাঁকে কে বলে দেবে?"

জীবক চমৎকৃত। সত্যই তো দুঃখের হেতু কি? তিনি রোগের হেতু খোঁজেন। দেহদুঃখের হেতু খোঁজেন। মনের দুঃখের হেতু কি?

অভয় বললেন—'শ্রাবস্তী থেকে এলেন রাজগৃহে।"

"রাজগৃহে?"

"হ্যাঁ, রাজগৃহে। রাজগৃহ ওঁর খুব ভালো লেগেছিল। শৈলমালা ঘেরা এই নগরী দেখে বলেছিলেন, 'আমি এখানেই থাকব'। তখন উনি ছিলেন ঋষিগিরিতে। সকালে ভিক্ষায় চলেছেন— বাতায়ন থেকে রাজা বিম্বিসার দেখলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী— উজ্জ্বল তাঁর মূর্তি—যেন প্রভাতের নবোদিত সূর্য। তিনি শ্রমণ গৌতমকে বললেন—'আপনি রাজগৃহে থাকুন। আমি আপনাকে আশ্রম করে দেব। চাষবাসের জমি দেব।"

জীবক প্রশ্ন করলেন—"শ্রমণ গৌতম ওঁর আর একটা নাম নাকি?"

"হ্যাঁ। উনি তো ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রিয়। তাই শ্রমণ। গৌতম গোত্রীয় বলে নাম গৌতম। তাছাড়া তখনো তিনি বুদ্ধ হন নি।

রাজার আমন্ত্রণে সন্তুষ্ট হয়ে গৌতম বললেন—'আমি তো বুদ্ধ হই নি। হলে আপনার রাজ্যে আসব। তারপর গয়াশীর্ষ

পর্বতে চলে যান। সে এক দুর্গম স্থান। ভয়াবহ জঙ্গল। হিংস্র প্রাণীদের দিবারাত্র বিচরণ। এখানে তপস্যা সম্ভব নয় বুঝে তিনি চলে গেলেন কাছের একটি গ্রামে। নৈরঞ্জনা নদী—তার তীরে উরুবিল্ব গ্রাম। সেখানে একটি ছায়াশীতল বটবৃক্ষ। তারি তলায় তিনি ধ্যানের আসন পাতলেন। শুরু হলো অপ্রাপ্য বোধির জন্য কঠিন তপস্যা। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, অহোরাত্র তপস্যা করে তাঁর দেহের মেদ ঝরে গেল। ত্বক, অস্থি, মাংস এক হয়ে গেল। এমন কৃশ হলেন যে উদরে হাত দিলে তা মেরুদন্ড স্পর্শ করতো। একদিন তো অজ্ঞানই হয়ে গেলেন। অন্য তপস্বীরা ভাবল, তিনি দেহত্যাগ করেছেন। শুদ্ধোদনের কাছে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ এলো। তিনি কিন্তু বিচলিত হলেন না। বললেন—'আমার পুত্র বুদ্ধ না হয়ে মরতে পারে না।'

তিনি লোক পাঠালেন—কিন্তু তার পূর্বেই সুজাতা বলে এক গোপনারী বুদ্ধকে বৃক্ষদেবতা ভেবে পায়েস খাইয়ে সুস্থ করেন। বুদ্ধ বুঝলেন, কৃচ্ছ্রসাধন চলবে না। মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার তপস্যা শুরু হলো। এবার রয়ে সয়ে। কিন্তু রুদ্রক রামপুত্রের কাছ থেকে যে পাঁচজন ভিক্ষু তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন—কৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, ভদ্র, বপ্র ও মহানাম—তাঁরা তাঁকে ভ্রষ্ট বলে ত্যাগ করে চলে গেলেন ঋষিপত্তনে। গৌতম একাই সাধনা করতে লাগলেন। এক চরিয়ং। একা চল। ছয় ছয়টি বছর কেটে গেল সাধনায়। তারপর বৈশাখী পূর্ণিমার শেষ রাতে পরম সত্য ফুটে উঠলো তাঁর সামনে। তিনি হলেন বুদ্ধ। সম্যক্ সম্বুদ্ধ। বোধি লাভের পর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আকাশে দু বাহু তুলে বললেন—

'গহকারক! দিটঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকুটং বিসঙখিতং।'

হে গৃহকারক ! দেখেছি তোমায়, কাটিল আমার ভয় ।
চূর্ণ করেছি গৃহসজ্জার উপকরণাদিচয় ॥

প্রথমে ভাবলেন, এই মহাবোধির কথা তিনি কাউকে বলবেন না। ফিরে যাবেন কপিলবাস্তু—যেখানে তাঁর অপেক্ষায় আছেন পিতা শুদ্ধোদন—বধূ যশোধরা—পুত্র রাহুল।"

জীবক প্রশ্ন করলেন—"শ্রমণের আবার স্ত্রী-পুত্র কি ?"

অভয় বললেন—"থাকবে না কেন ? সংসারকে না বুঝলে সংসারের দুঃখ বুঝতেন কেমন করে ?"

"তারপর ?"

"কিন্তু পরম সত্য লোকসমাজে প্রচার না করে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। যেন তাঁর অন্তরে কে বলছিল—'ত্রাণ কর প্রভু আমাদের ত্রাণ কর—যে অমৃতবাণী তুমি লাভ করেছ তা আমাদের পান করতে দাও।'

উরুবিল্বে তিন চারমাস নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন লোকহিতের জন্য তিনি 'শাস্তা' (শিক্ষক) হবেন।

এলেন ঋষিপত্তনে—সহচর সেই পঞ্চ ভিক্ষুকে খুঁজে বার করলেন। বোঝালেন তাঁর নবধর্ম—সদ্ধর্ম। চারদিন তর্ক বিতর্কের পর কৌণ্ডিন্য ও মহানাম বুঝলেন। আরো কয়েকদিন লাগলো অশ্বজিৎ, ভদ্র ও বপ্রকে বোঝাতে। একজন করে ভিক্ষায় যেত—বাকিরা ধর্ম নিয়ে জোর তর্ক করত। ভিক্ষায় যা মিলত সবাই ভাগ করে খেতো। এরপর দু একটি শিষ্য হলো। যেমন—কোশলের শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ, তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও তাঁর পিতা-মাতা। শাস্তা প্রথম বর্ষা যাপন ঋষিপত্তনেই করেন।

বর্ষা শেষে আবার এলেন গয়ায়। তারপর উরুবিল্বে। এখানে জটিল কাশ্যপরা তিন ভাই ছিলেন। তাঁদের তিনি শিষ্য করলেন।

ওদিকে রাজা বিম্বিসার কিন্তু বুদ্ধের সন্ধান পেয়েছিলেন।

তিনি গয়ায় লোক পাঠালেন বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে আনার জন্য। বিম্বিসারের পুণ্য, রাজগৃহের সৌভাগ্য যে সেই সিদ্ধপুরুষ সম্মত হলেন আসতে।

রাজগৃহের বাইরে যে লঠ্‌ঠিবন আছে সেখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। সে এক শুভলগ্ন। বিম্বিসার তার পরদিনই তাঁকে বেণুবন আরামে আহারের নিমন্ত্রণ জানালেন। জান তো—বুদ্ধকে যদি কেউ আহারের নিমন্ত্রণ জানায় এবং তিনি যদি মৌন থাকেন তবেই বুঝতে হবে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। যাই হোক—পত্রে, পুষ্পে, নিশানে সারা পথ সজ্জিত হলো। বাঁশী বাজলো, ভেরী বাজলো, মৃদঙ্গ-বীণ-করতাল দিকবিদিকে ধ্বনিত হলো। রাজগৃহের সব বিশিষ্ট নাগরিকেরা সেই ভোজন উৎসবে নিমন্ত্রিত হলেন। রাজা বিম্বিসার স্বহস্তে সবাইকে খাদ্য পরিবেশন করলেন।"

"স্বয়ং, রাজা! স্বহস্তে!" জীবকের বিস্ময়ের সীমা নেই।

অভয় শান্ত কণ্ঠে বললেন—"বৎস, তাই তো নিয়ম। সম্মানিত অতিথিকে স্বহস্তে পরিবেশনই তো সর্বোচ্চ সম্মান দান। নীবার চালের সুগন্ধি অন্ন, যবাগু, পুরোডাশ আর পায়েস। ভোজনের অন্তে বুদ্ধ উপদেশ দিলেন। এই তাঁর নিয়ম। গৃহস্থের আহার দানের পরিবর্তে তিনি তাকে ধর্মদান করেন। বিনিময়। ভিক্ষা নিয়েছি ঠিক কিন্তু পরিবর্তে কিছু দিতে হবে। একজন সর্বত্যাগী শ্রমণ কি দিতে পারে? পার্থিব কোন বস্তু তো তার নেই! সে শুধু দিতে পারে অধ্যাত্মবস্তু। শাস্তা বোঝালেন চারটি আর্যসত্য কাকে বলে। উপদেশ দানের পর রাজা বিম্বিসার স্বর্ণভৃঙ্গারে করে তীর্থজল এনে বুদ্ধের চরণ ধুয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বেণুবন আরাম। বললেন 'এই বেণুবন হোক আপনার প্রথম বিহার। এখানে স্থাপিত হোক আপনার ধর্মচক্র যা আপনি ঋষিপত্তনে প্রথম চালনা করেছেন। হে ধর্মরাজিক, এখানেই শুরু হোক বুদ্ধউদ্যোগ। এখন থেকে এই হোক আপনার বর্ষাবাসের

কেন্দ্র। এখানেই রোপিত করুন আপনার ধর্মাঙ্কুর। রাজগৃহের অধিবাসীদের আপনি প্রতিদিন সদ্ধর্ম শিক্ষা দিন।'

তারপর থেকে এই দুই বছর উনি এখানেই আছেন। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উপদেশ দিচ্ছেন। দিনে তিনবার ধ্যান করেন। একবার মাত্র আহার করেন। তাও ভিক্ষান্ন।

আমি তো অনেক সাধু দেখেছি,—মঙ্খলীপুত্র গোশাল, নির্গ্রন্থি নাথপুত্র, অজিত কেশকম্বলী, বৈরাটিপুত্র সঞ্জয়, ককুদ কাত্যায়ন, পূরণ কাশ্যপ। কিন্তু প্রজ্ঞা ও করুণার এমন সমাহার কোথাও দেখি নি।"

শার্দুল কোথা থেকে ঘুরে এসে বলল—"কুমারভৃত্য, এবার বিশ্রাম করবেন চলুন। বিহারে শেষ মন্ত্রপাঠও সমাপ্ত। শাস্তার কথা উঠলে আজ তো সারা রাত শেষ হয়ে যাবে। ওঁর কথা আর ফুরোয় না।"

বহু দিনের পুরাতন লোক। তাই এমনভাবে কথা বলে। কিন্তু প্রভুর প্রতি আনুগত্য কি গভীর। অভয় উঠে বাতায়নের কাছে দাঁড়ালেন। যবনিকা সরিয়ে বিহারের দিকে জোড়হস্তে নমস্কার জানালেন। জীবককে ডাকলেন—"দেখ, দেখ, জীবক, ঐ বেণুবন বিহারশীর্ষটি দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় কেমন সুন্দর!"

জীবক উঠে এলেন। আড়চোখে দেখলেন, সোমপ্রভা শালবতীর দিকের বাতায়নের যবনিকা টেনে দিচ্ছেন। অভয় সহসা ফিরে কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন বুদ্ধবাণী—

"চিত্রিত-দেহ-দর্শনে-জাগা ভ্রান্তিরে কর দূর,
অনিত্য ইহা বাসনাপূর্ণ, ক্ষতময়, রোগাতুর।"

জীবক নির্বাক। কুমারঅমাত্য সত্যই বদলে গেছেন। সেই প্রমোদপ্রিয়, বিলাসী, পানাহারে আসক্ত, কাঞ্চনলুব্ধ, রমণী-রূপে মুগ্ধ মানুষটি আর নেই।

* * *

জীবক নিজ কক্ষে এলেন।

দুগ্ধফেননিভ শয্যা। দীপাধারে দীপ জ্বলছে। একটি থালায় কিছু সুরভিত ফুল। ভৃঙ্গারে পানীয় জল। শার্দুল নিয়ে এলো কিছু রুটি ও উষ্ণ দুগ্ধ। নিয়ে এলো কাশীর শর্করা। দুগ্ধ পান করতে করতে জীবক প্রশ্ন করলেন—"শার্দুল, তুই বুদ্ধকে দেখেছিস ?"

"বাঃ, ওঁকে দেখি নি! ওঁকে কে না দেখেছে ? প্রতিদিন কত কত লোকে ওঁকে দেখতে যায়। আবার উনিও ভিক্ষা মাগতে কত কত লোকের বাড়ি যান। রাজগৃহ ছাড়িয়ে ঐ অম্বলক্ষিকা গ্রাম পর্যন্ত। কথা বলেন, লোকের কথা শোনেন—উপদেশ দেন। তাঁকে দেখব না ? কি যে বলেন, কুমার ভৃত্য!"

"তাঁকে তোর কেমন লাগে ?"

শার্দুল মুখ গম্ভীর করে বলল—"খুব শক্তিধর। জলে ভাসতে পারেন। আকাশে উড়তে পারেন। বিষধর সাপ পোষ মানাতে পারেন। পাগলা হাতি বশ করতে জানেন। ওঁর এক শিষ্য আছে—মোগ্গলায়ন—সে ইদ্ধি জানে !!! থাকে ঐ ইসিগিলি পর্ব্বতে।"

"ইদ্ধি নয়, বল্ 'ঋদ্ধি'। ইসিগিলি নয়, বল্ 'ঋষিগিরি'।"

"হ্যা গো, তাই তো বলছি—'ইদ্ধি ইদ্ধি', 'ইসিগিলি ইসিগিলি'।"

জীবক হেসে ফেললেন।

শার্দুল কিন্তু হাসলো না। বড় বড় চোখ করে বললো—"উনি কি করেছেন, জানো ? একদিন অজিত শ্রেষ্ঠীর বাড়ির সাততলায় উড়ে গেছেন। অজিত শ্রেষ্ঠী তো, জানো, হাড় কেপ্পন। সাততলায় উঠে বউকে দিয়ে পিঠে ভাজিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছিলো। মোগ্গলায়নকে সেখানেও দেখে রেগে আগুন। কি করে, বউকে বললে—'কাঠির আগায় যেটুকু পিটুলি ধরে তাই দিয়ে একটা ছোট্ট পিঠে বানিয়ে দাও।' বউ তাই করল। পিঠে বড় হয়ে থালার মত আকার নিল। শ্রেষ্ঠী তা রেগে খুন, বলল—'ওটা

আমাকে দাও, আর একটা ছোট্ট পিঠে কর।' বউ আবার কাঠির আগায় পিটুলি তুলে কড়ায় দিল। আবার থালা! বার বার তিন বার এরকম হতে লাগল। শ্রেষ্ঠী কি করে—ঐ পিঠেই শ্রমণকে দিলে। শ্রমণ তো শ্রেষ্ঠীকে দানের জন্য খুব প্রশংসা করলেন। তারপর পথে গিয়ে পাড়াশুদ্ধ সবাইকে ঐ পিঠে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিলেন, তবু পিঠে ফুরোলো না। শ্রমণ বলতে লাগলেন—'দানের মহিমা দেখ। এই একটি পিঠে সবার পেট ভরালো।' এর উপর ঐটুকু দানের জন্য শ্রেষ্ঠী নাকি মৃত্যুর পর সুখাবতী স্বর্গে যাবে। মোগ্গলানকে কেউ ঘাঁটায় না, বাবা। উনি অনেক কিছু পারেন। অজিত শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে পিঠে আদায় করা কি সহজ কাজ? শুনেছি, বুদ্ধ নাকি ওঁকে খুব ভালবাসেন। উনি নাকি বুদ্ধের বাঁ হাত।"

জীবক কৌতুকের সুরে বললেন—"ডান হাতটি কে?"

"বাঃ, ওঁর বন্ধু আছে না? সারিপুত্র।"

"সারিপুত্র, সারিপুত্র।" জীবক দুবার নামটি উচ্চারণ করলেন মনে রাখবার জন্য।

"হ্যাঁ গো, কুমার ভৃত্য। ওঁরা ছিলেন আগে বৈরাটিপুত্র সঞ্জয়ের শিষ্য। শ্রমণ অশ্বজিৎ কি সব বলে ওদের ভাঙিয়ে নিয়ে আসেন। আর যায় কোথায়? লেগে গেলো হট্টগোল। পাড়ার ছেলেরা ছড়া বাঁধলো—

'শ্রমণ গৌতম এবার কাকে ভাঙাবে
সঞ্জয় বৈরাটির দলের কাকে রাঙাবে?'

বৌদ্ধ শ্রমণেরা আর ভিক্ষা করতে পারেন না। বুদ্ধ শুনে হেসে আর একটি ছড়া বেঁধে দিলেন—

'শ্রমণ গৌতমের সদ্ধর্ম শোন সবে,
ধর্মকথা শুনলে কেন ক্ষতি হবে?'

ব্যস্! সব চুপ।"

জীবক শুনে খুব হাসলেন। বললেন—"তোমদের শাস্তার খুব রঙ্গবোধ আছে দেখছি।"

"হ্যাঁ গো, একটু একটু হাসেন। সুন্দর সব গল্প বলেন। বাচ্চাদের খুব ভালবাসেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের ভর দুপুরে, ঐ নিগ্রন্থিদের শিষ্য হয়—কয়েকটি বাচ্চা বিহারে হাজির। বলে কি না, 'জল খাব'। বিহারে সবাই তখন যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে, কি ধ্যান করছে। বুদ্ধ নিজে উঠে কলস থেকে জল এনে ওদের খাওয়ালেন। তারপর গল্প শোনালেন। দুপুরের ঐ রোদে বেরুতে দিলেন না। রোদ পড়ে এলে সবার হাতে একটি করে আম দিয়ে বিদায় দিলেন। তারা তো মা-বাবার কাছে গিয়ে এইসব বলেছে। মা-বাবা তো অবাক। তারা নিগ্রন্থি, বৌদ্ধ নয়, তবু বাচ্চাদের প্রতি তাঁর এই করুণা! তারা অনেকে এসে আবার শাস্তার শিষ্য হয়ে গেলো।"

জীবক বললেন—"তাহলে তোমরা খুব মজায় আছ দেখছি।"

"খুউউব। এবার শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে। কাল আবার অনেক গল্প শোনাবো।"

শার্দুল দীপ নিবিয়ে দিয়ে চলে গেলো। ঘরে অমনি ছড়িয়ে পড়লো মায়ের স্নেহের মতো একরাশ জ্যোৎস্না। চাঁদই তো তাঁর মা। ছেলেবেলায় পিতার পাশে শুয়ে চাঁদকেই তো জীবক 'মা' বলে ডাকতেন। স্নিগ্ধ, শীতল, শুভ্র! মা তো এমনই হয়।

কিন্তু লোকে বলে নটিমুখ্যা শালবতী তাঁর মা। একি সত্য? এই চৌষট্টিকলাভিজ্ঞা রূপসী নটির মধ্যে মায়ের মন কোথায়? কই, কখনো তা তিনি জীবককে কোন স্নেহ দেখান নি। অথচ বৈশালীর নটিমুখ্যা আম্রপালি অভয়ের কত সংবাদ নেন, কত উপহার পাঠান।

জীবক চিরদিনই দুঃখী, বিষণ্ণ, নিংসঙ্গ মানুষ। তাই কি তিনি অন্তর্মুখী বুদ্ধিজীবী? জীবনটা যেন তাঁর এক ধূধূ মরুভূমি।

মরুভূমিতে যেমন খর্জুর বৃক্ষের ছায়া একান্ত আশ্রয়—তেমনি তাঁর একমাত্র আশ্রয় ধী-শক্তি। হঠাৎ তাঁর মনে হলো সোপানে দাঁড়ানো প্রায় অদৃশ্য নারী মূর্তিটি কে? সে তো সোমপ্রভা নয়। কে সে? শার্দুলকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আবার মনে পড়লো অভয়ের কথা। সেই মহামানবের কাছে কাল যাব। দেখব দুঃখ-তীর বিদ্ধ মানুষকে তিনি সুখী হবার পথ দেখাতে পারেন কি না। তারপর চাঁদের আলো গায়ে জড়িয়ে জীবক ঘুমিয়ে পড়লেন।

* * *

একটি উজ্জল প্রভাত।

অব্জ সরোবরের জলে স্নান করে জীবক শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উত্তরীয় পরে অভয়ের কক্ষে প্রবেশ করলেন। অভয় পালঙ্কে বসে আছেন। ধ্যান করছেন। চক্ষু মুদ্রিত। একটু পরে চোখ খুললেন। জীবক শুধালেন—"আজ কেমন আছেন?"

"ভাল—খুব ভাল।" অভয়ের মুখ প্রফুল্ল।

"এই বটিকা দুটি দুধ দিয়ে খাবেন। আমি রাজসভায় যাচ্ছি।"

"শাস্তার কাছে যাবে না?"

"নিশ্চয় যাবো। আমার ফিরতে বিলম্ব হলে আপনি চিন্তিত হবেন না।"

জীবক তাঁর ক্ষুদ্র রথ চালিয়ে রাজসভার দিকে চলে গেলেন।

সভায় প্রবেশ করে দেখলেন সিংহাসনে সুবর্ণকান্তি, ঈষৎ স্থূল, রাজা বিম্বিসার বসে আছেন। দুপাশে সার দিয়ে বসেছেন অমাত্যবর্গ। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে বসেছেন যুবরাজ অজাতশত্রু। তাঁর বাঁ হাতটি একটু বাঁকা। হাতের মত তাঁর মনটিও বাঁকা। জীবকের চোখে তা ফুটে উঠলো। তাঁর পাশে তরুণ মন্ত্রী বর্ষকার। শুক পক্ষীর মত নাসা—তীক্ষ্ণ চোখ—যুবরাজের অন্তরঙ্গ।

রাজার বাম পাশে মহামাত্য গোপাল। তাঁর পাশে রানী চেল্লানার পুত্র হল্ল, বেহল্ল। শ্রমণদের মধ্যে বসে আছেন বিমল

কৌণ্ডিন্য এবং শীলব্য। রাজার পেছনে অসি হাতে দাঁড়িয়ে কাল এবং জয়সেন—আর দুই পুত্র।

সভা জমজমাট। একদিকে ব্রাহ্মণেরা বসে আছেন। অন্যদিকে শ্রমণেরা। প্রার্থীরা তো আছেনই। কেউ এসেছেন চতুষ্পাঠীর জন্য অর্থ চাইতে, কেউ এসেছেন কূপ খননের অনুমতি চাইতে, কেউ চান পথের সংস্কার, কারো বা কন্যাদায়। নানা প্রার্থনা।

রাজা বিম্বিসার দক্ষ প্রশাসক। সব দিকে তাঁর দৃষ্টি। মন্ত্রীদের প্রতি তাঁর কড়া নজর। অসাধু কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে তিনি দ্বিধা করেন না। আবার সাধু কর্মচারীদের পদোন্নতি করতেও বিলম্ব করেন না।

যুবরাজ অজাতশত্রু একটু ফাঁক পাচ্ছেন না যে ছিদ্র দিয়ে তিনি রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। অজাতশত্রু নামটির অর্থ কি? জন্মের পূর্বেই যিনি শত্রু—তিনিই অজাতশত্রু। জন্মের পূর্বেই নাকি তাঁর মা রানী বৈদেহীর সাধ হয়েছিল রাজরক্ত পান করবেন। কথাটা শুনে বিম্বিসার ক্রুদ্ধ হন নি। দৈবজ্ঞরা যখন বললেন, 'এই পুত্র মহারাজের প্রাণসংহার করবে'—তিনি বিচলিত হলেন না।

রানী বৈদেহী কিন্তু স্থির থাকতে পারেন নি। গর্ভপাতের জন্য তিনি কুক্ষি মর্দন করতে লাগলেন। রাজা শুনে বৈদেহীকে ভর্ৎসনা করেছিলেন—"ছিঃ ছিঃ রানী, একি করছ? আমাকে পুত্রমুখ দেখতে দাও। আমি তো অমর নই।" এই বলে তিনি দক্ষিণ জানু কেটে একটি পাত্র রক্তে পূর্ণ করে রানীকে পান করালেন। রানী কিন্তু শোনেন নি। উদ্যানে নিভৃত স্থানে গিয়ে কুক্ষি মর্দন করাতে লাগলেন। হয়তো এজন্যই অজাতশত্রুর একটি হাত জন্ম থেকেই বাঁকা। লোকে পরোক্ষে পরিহাস করে তাঁকে ডাকতো 'কুণিক'।

জীবক দেখলেন, বিম্বিসার সিংহাসনে বসে আছেন বটে কিন্তু

মন নেই তাতে। কেমন যেন অন্যমনস্ক। জীবক সভায় এসে দাঁড়াতেই একটা চাঞ্চল্য দেখা গেলো। বিম্বিসার প্রসন্ন মুখে বললেন—"এস জীবক।" জীবক সবাইকে অভিবাদন করে নিয়োগ-পত্রটি মহামাত্যের হাতে দিয়ে আসনে বসলেন। সোরগোল শুরু হয়ে গেলো। একজন ভাল বৈদ্য এসেছেন শুনে অনেকেরই নিজ নিজ রোগের কথা মনে পড়ে গেলো। মহামাত্যের কাস থেকে অজীর্ণ হয়েছে। পুরোহিত বসুবন্ধুর গলা ব্যথা। রাজকুমার হল্লের কপাল টিপটিপ করছে। বেহল্লের দাঁত কনকন। জীবক পেটিকা খুলে ঔষধ দিয়ে কিছু রোগের প্রতিকার তক্ষুণি করলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল অজাতশত্রুর দিকে। আড়চোখে যুবরাজকে দেখে নিয়ে সহসা বললেন—"যুবরাজের কি সুনিদ্রা হচ্ছে না?"

অজাতশত্রু চমকে উঠলেন—"তুমি কি করে তা জানলে?"

সভাস্থ সকলে তটস্থ। কে না জানে অজাতশত্রুর স্বভাব। আর জীবক কিনা তাকেই ঘা দিল!

জীবক বললেন—"আপনার চোখের তলায় কাজলের মত কালিমা। চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত। অনেক দূর থেকে ভারী বোঝা নিয়ে আসা মানুষের মত মণি দুটি শ্রান্ত।"

অজাতশত্রু একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—"কাল রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় নি।"

জীবক বললেন—"শুধু কাল নয়। অনেক অনেক দিন আপনার সুনিদ্রা হয় নি। অনেক অনেক দিন আপনি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। কেন কুমার? আপনি রাজগৃহের আশা। আপনি স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করলে চলবে?"

অজাতশত্রু সন্তুষ্ট হলেন।

এতক্ষণ তিনি জীবককে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন একি তাঁর বশম্বদ হবে? তক্ষশিলার স্নাতক। দেশে আসা মাত্র বিম্বিসার তাঁকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রতি মাসে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বেতন। জীবকের আত্মীয়রাও সুপ্রতিষ্ঠিত। কুমার অমাত্য অভয়ের তিরি গূঢ়পুত্র। যুবরাজ ভেবেছিলেন 'এ নিশ্চয় অতি গর্বিত হবে'। কিন্তু জীবক আবাল্য দুঃখের সঙ্গে পরিচিত। মুহূর্তে তিনি এই অহংকারী, সংশয়ী কুমারকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেললেন। রাজসভার আর কেউ তা বুঝল না—শুধু বুঝলেন বিম্বিসার। জীবকের কূটবুদ্ধি দেখে তিনি খুব খুশি। বললেন—"চল, তোমাকে সম্যক সম্বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাই।"

বিরক্ত অজাতশত্রু বললেন—"সভার কাজ এখনো শেষ হয় নি, মহারাজ।"

বিম্বিসার হেসে বললেন—"তথাগতের কাছে সভার কাজ? তুমি আছ, মহামন্ত্রী আছেন, রাজকুমারেরাও আছেন। সভার কাজ তোমরাই চালাও।"

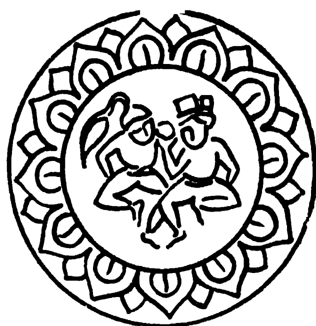
জীবক কিন্তু কৌতূহল দেখালেন না। বরং পাল্টা প্রশ্ন করলেন—"বুদ্ধ কি প্রত্যক্ষ হয়?"

এবার অজাতশত্রু খুশি। ঐ লোকটা যাদু জানে। পিতাকে অভিভূত করে রেখেছে। তাঁর রাজকার্যে মন নেই। চারদিকে শত্রু। উত্তরে বৃজি, পূব দক্ষিণে চণ্ড প্রদ্যোত, কোশলও আছে। জীবকের প্রশ্ন তাঁরও প্রশ্ন—"বুদ্ধ কি প্রত্যক্ষ হয়?"

বিম্বিসার উচ্চারণ করলেন সেই পদ, যেটি আগের রাত্রে অভয়ের মুখে শুনেছিলেন জীবক—

"মানবজীবন দুর্লভ অতি—জীবন রক্ষা যুদ্ধ,
সত্যধর্ম শ্রবণ কঠিন—অতি দুর্লভ বুদ্ধ।
এই উত্তম শরণ লভিলে জীবের মুক্তি আসে।
এই উত্তম শরণ লভিলে সর্বদুঃখ নাশে।"

সভার কোলাহল থেমে এলো। বিম্বিসার সিংহাসন ছেড়ে সভা ত্যাগ করলেন। পেছন পেছন জীবকও গেলেন।



বেণুবন বিহার।

পাশেই কলন্দক নিবাপ নামে স্বচ্ছ পুষ্করিণী। নির্মল সবুজ জলে সোনালী আলোর ঝিলিমিলি। বিম্বিসার জীবককে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন বুদ্ধ ও তাঁর পাঁচশত শিষ্য ধ্যানমগ্ন। অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো নিবাত নিষ্কম্প। সেই সমুদ্রের উপর পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত। না না, বলা ঠিক হলো না। সূর্য এবং চন্দ্র, সমুদ্র ও আকাশ যেন একত্রে সমন্বিত। প্রথম কয়েক মুহূর্ত সম্পূর্ণ আবিষ্ট হয়ে রইলেন জীবক। তারপর তাঁর বৈদ্য-দৃষ্টি কাজ করতে শুরু করলো। তিনি দেখলেন বুদ্ধরূপ।

গৌরবর্ণ, শান্ত, গম্ভীর মুখচ্ছবি। দীর্ঘ আকৃতি। মাথার মধ্যস্থল উঁচু, যেন চূড়া বেঁধেছেন, মুণ্ডিত মস্তক, তাতে অল্প কুঞ্চিত চুল। প্রশস্ত কপাল। যুগ্ম ভ্রূ—তার মধ্যে একটি কেশগুচ্ছ। দীর্ঘ পদ্মচক্ষু। বিস্তৃত স্কন্ধ। আজানুলম্বিত বাহু। ধ্যান শেষ হলো।

একটি মৃদু গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—

"দুঃখ কত রকম হয়?

দুঃখ দশ রকম। ক্ষত, কঠিন রোগ' চিত্ত-বিকার, রাজদণ্ড, প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয়-সংযোগ, অপবাদ, অঙ্গহানি, অর্থহানি, গৃহদাহ। অন্যের প্রতি অন্যায় করলে এই দশ দুঃখের একটি ভোগ করতে হয়।

দশটি কুশল কর্ম আছে। দান, শীল, সেবা, পুণ্যদান, পুণ্যকর্মে উৎসাহদান, ধর্ম শ্রবণ, ধর্ম প্রচার, সম্যক ভাবনা, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক চিন্তা।

কুশলী মালাকারের মত সুন্দর ফুল দিয়ে জীবনমাল্য রচনা কর। শিক্ষা দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে, সুভাবিত চিত্ত দিয়ে, সদয় হৃদয় দিয়ে।

রাজবুদ্ধি হলো সাম্য, মৈত্রী, ভেদ, দণ্ড। ধর্মবুদ্ধি তা নয়— সাম্য, মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা। মন্দকে করুণা দিয়ে শোধন কর। যদি তা শোধনের অযোগ্য হয়, উপেক্ষা কর।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অষ্ট মার্গে অধিষ্ঠিত থাক। আট মার্গ কি? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক ব্যায়াম এবং সম্যক সমাধি।

দুঃখ নিরোধের উপায় এই অষ্টমার্গ পালন।

কিন্তু দুঃখের উদয় কেন হয়? তণ্হা (তৃষ্ণা) থেকে। যে তৃষ্ণা জয় করে সে অর্হৎ হয়।

তৃষ্ণা থেকে আসে বাসনা। ত্রিবিধবন্ধন (অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস, সন্দিগ্ধতা ও ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে বিশ্বাস) ছিন্ন করলে ও বাসনা জয় করলে সে অনাগামী হয়। বাসনা থেকে আসে ইন্দ্রিয় ভোগ। যে ত্রিবিধবন্ধন ও ইন্দ্রিয় জয় করে সে হয় সকৃদ্‌গামী। যে শুধু ত্রিবিধবন্ধন ছিন্ন করে সে হয় স্রোতাপন্ন।

এই দুঃখময় জগতে বার বার কেন জন্ম নেবে!

ধর্ম কথা শ্রবণ কর এবং শ্রোতাপন্ন হও।
ইন্দ্রিয় জয় কর, সকৃদ্‌গামী হও।
বাসনা জয় কর, অনাগামী হও।
তণ্হা (তৃষ্ণা) জয় কর, অর্হৎ হও।”

উপদেশ শেষ হলো।

ভিক্ষুরা দাঁড়িয়ে উঠে মন্ত্র পাঠ করলেন।

"ইহ মোদতি, পেচ্চ মোদতি,
কত পুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি,
... ...
ভিয্যো মোদতি সুগগতিং গতো।"
কৃতপুণ্যের এ জগতে সুখ, পর জগতেও তাই,
উভ জগতেই আনন্দ লাভ করে সে সর্বদাই।

বিম্বিসার এবার জীবককে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন। তথাগতকে প্রণাম করে বললেন—"এই জীবক। তক্ষশিলার স্নাতক—রাজগৃহের রাজবৈদ্য।"

বুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন রাজার কথা। আর জীবক মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের চরণ দুটি—পদ্মের মত লাল, রেশমের মত মসৃণ, স্পর্শরত্নের মত অভয় দাতা। এই চরণেরই তো শরণ নিতে হবে। কিন্তু ও কি? পদ্মে যেন শিশির বিন্দু! অঙ্গুষ্ঠে একটি বিস্ফোটক! পেকে টুলটুল করছে। জীবক কোমরপেটিকা থেকে একটি সূঁচ বার করে স্ফোটকটি চিরে দিলেন—চিমটে দিয়ে তুলে নিলেন একটি ত্রিশিরা কাঁটা। কার্পাস তুলো দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরলেন। মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটে গেল। বুদ্ধ 'উঃ' ধ্বনিটি করেছেন কি না করেছেন জীবক কাঁটাটি তুলে ভিক্ষু সংঘকে দেখালেন। ভিক্ষুরা প্রথম ত্রস্ত, তারপর উল্লসিত হলেন। একটা হর্ষধ্বনি উঠলো। সারিপুত্র ছুটে এসেছিলেন বুদ্ধের কাছে—ছুটে এসেছিলেন মোগ্গলায়নও। বুদ্ধ ঈশারায় তাদের সরে যেতে বললেন। সংঘকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, দেখ, সংসার এই কাঁটার মত আমাদের সর্বদা বিদ্ধ করছে।"

মহানাম বললেন—"পরশু আপনি যে চিত্র শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেছিলেন সেখানে অনেক খেজুর গাছ ছিল। তার কাঁটাই ফুটেছে। কিন্তু আপনার কি সহ্যশক্তি! এ দুদিন ধরে কাঁটার ব্যথা

কি করে সহ্য করলেন ? ভাগ্যি, এই ভিষক্ আপনাকে সুস্থ করে তুলল।"

বুদ্ধ মৃদু হাসলেন। তারপর জীবকের দিকে তাকিয়ে বললেন—

"আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং

বিসসাস পরম জ্ঞাতি নিরবাণং পরমং সুখং।"

জীবক বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। করুণাঘন তাঁর গোলাপী দুটি হাত জীবকের মাথায় রাখলেন। আহা! এ যেন জীবকের মায়ের হাতের পরশ—যে স্পর্শ তিনি সারা জীবন ধরে খুঁজেছেন। কি করুণা!

কি করুণা!

কিছুক্ষণ পরে জীবক চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মধ্যে বৈদ্য-সত্তা ফিরে এলো। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"এই ক্ষত নিয়ে আপনি আজ ভিক্ষায় যাবেন না।"

বিম্বিসার ব্যস্ত হয়ে বললেন—"ঠিক কথা। আজ প্রভুকে আমি ভিক্ষা দেব।"

আবার হর্ষধ্বনি উঠলো। আজ যে সে ভিক্ষা নয়। রাজ ভিক্ষা। শ্রমণেরা খুব খুশি। যে যার ঘরে চলে যেতে লাগলেন। দু-চার জন বৃদ্ধ শ্রমণ বুদ্ধের সঙ্গে এসে কথা বললেন।

হঠাৎ রত্নশ্রেষ্ঠী এসে জীবকের কাঁধে টোকা দিলেন। "কি বন্ধু, মাত্র কাল সন্ধ্যায় এসে আজই বিখ্যাত হয়ে গেলেন? আপনি পয়মন্ত লোক। শাস্তার কৃপা কি যে সে পায়? আপনাকে নিয়ে উনি পদ্য রচনা করলেন। নাঃ, আপনি সত্যই ভাগ্যবান।"

জীবক মৃদু হাসলেন—"তুমি আমার সত্যকার বন্ধু, মহাশ্রেষ্ঠী—তুমি আমাকে সত্যপথ দেখিয়েছ।"

রত্নশ্রেষ্ঠী চোখ টিপে বললেন—"আজ বিকেলে আসুন। আর এক রঙ্গ দেখবেন।"

জীবক প্রসন্ন কণ্ঠে শুধালেন—"কি ব্যাপার?"

"চিত্র শ্রেষ্ঠী, যাঁর বাড়িতে খেতে গিয়ে কাঁটা ফুটল, তাঁরই শ্যালক হলেন শ্রাবস্তীর সুদত্ত শ্রেষ্ঠী। খুব ধার্মিক। রোজ পাঁচশ লোককে খাওয়ান। তাই ওঁর আর এক নাম 'অনাথ পিণ্ডদ'। বুদ্ধকে দেখে তো তিনি মুগ্ধ। আজ ভোরে এসে প্রভুকে শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাসের নিমন্ত্রণ করেছেন।

শাস্তা বলেছেন—'গৃহপতি, আমি তো জনাকীর্ণ নগরে থাকি না। শ্রাবস্তী অতি জনাকীর্ণ স্থান।'

সুদত্ত বললেন—'ভদন্ত, আমি নগরের বাইরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করব। তা আপনার মনোমত হবে। নগরীর থেকে দূরেও নয়—কাছেও নয়। নিকটে গ্রাম থাকবে। তাতে আপনার ভিক্ষার সুবিধে হবে। বিহারে সরোবর থাকবে। তার জল পান করতে পারবেন।'

বুদ্ধ বললেন—'মহাশ্রেষ্ঠী, বর্ষাবাসের অনেক ঝামেলা। আমার পাঁচশত শিষ্য সঙ্গে যাবে। তাদের চাল গম যব, জ্বালানী…'

সুদত্ত বললেন—'ও সব আমার ভার। আপনাকে ভাবতে হবে না। পাঁচশত কেন? সহস্র ভিক্ষু নিয়ে আপনি আসুন না—কোশল আপনাকে আতিথ্য দেবে।'

শাস্তা বললেন—'বড় কঠিন কাজ, মহাশ্রেষ্ঠী।'

সুদত্ত বললেন—'কঠিনেই তো আনন্দ, প্রভু।'

শাস্তা তখন ওর প্রতি স্নেহদৃষ্টি রেখে বললেন—'তোমার এত আগ্রহ? যাব।'

সুদত্ত তখন বললেন—'ঠিক কবে আপনি যাবেন তা আমি আপনাকে জানাবো। যে বিহার আপনার জন্য নির্মাণ করব তার পরিকল্পনা কিন্তু আপনাকে করতে হবে। আমার কাজ শুধু অর্থ যোগানো।' সুদত্ত যেমন ধনী—তেমনি সংকল্পবান। জেদীও বলতে পারেন। শাস্তাকে যখন নিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন উনি নিয়ে যাবেনই। ওদিকে মহারাজ শুদ্ধোদন লোক পাঠাচ্ছেন পুত্রকে একবার কপিলবাস্তু নিয়ে যাবার জন্য। সন্ন্যাসের পর বারো

বছর তো হয়ে গেছে। নিয়ম মতো এবার একবার জন্মভূমি দেখা দরকার। পুত্রের বুদ্ধরূপও তিনি দেখতে চান। তিনি তো আর শ্রমণ হন নি—নির্মায়িক, নির্মোহও হন নি। পুত্রকে দেখতে চাইবেন এ তো স্বাভাবিক। কয়েক মাস ধরে তাঁর লোকেরা আসছে আর শাস্তার উপদেশ শুনে ভিক্ষু হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কেউ কিছু বলছে না।"

জীবক স্মিতহাস্য করে বললেন—"এখন উপায় ?"

রত্নশ্রেষ্ঠী বললেন—"মাসখানেক আগে ওঁর বাল্যবন্ধু কালুদায়ী এসেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ। খুব বুদ্ধিমান। ভদন্ত যেখানে যাচ্ছেন কালুদায়ীও যেখানে যাচ্ছেন। ভদন্ত গৃধ্রকূটে ধ্যান করছেন, কালুদায়ীও সেখানে গিয়ে ধ্যান করছেন। ভদন্ত সর্পিণী নদীর তীরে বেড়াচ্ছেন, কালুও পেছন পেছন হাঁটছেন। ভদন্ত সপ্তপর্ণী গুহায় কাশ্যপকে দেখতে গেছেন—কালুও গেছেন। ভদন্ত শীতবনে তো কালুও শীতবনে। ভিক্ষু হয়েছেন, চীবর পরেছেন, উপদেশ শুনছেন।

কালু মোগ্গলায়নকে খুব পটিয়েছেন। সারিপুত্রকেও পটাবার চেষ্টা করছেন। তবে জানেন তো, সে হলো জালমুক্ত শকুন্ত। তাকে পটানো কঠিন। তবে সবাই শাস্তার পিতৃরাজ্য দেখতে কৌতূহলী। তাই আজ তিনি নিজেই ধর্মরাজিককে বলবেন। সঙ্গে থাকবেন মোগ্গলায়ন, পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু, কাশ্যপ, কাত্যায়ন।

জীবক শুধালেন—"পঞ্চবর্গীয় কারা ?"

"পঞ্চবর্গীয়রা হলেন ওঁর প্রথম শিষ্য। কৌণ্ডিন্য, মহানাম, ভদ্র, বপ্র, অশ্বজিৎ। ঋষিপত্তনে প্রথম এঁদের কাছেই প্রভু ধর্মপ্রচার করেন। এখন দেখা যাক শাস্তা কি বলেন। বিকেলে সেই রঙ্গটাই হবে। আপনি কিন্তু আসবেন।"

"যদি পারি।"

"কেন ? এখুনি আপনার রোগী আসতে শুরু হয়েছে নাকি ?"

"তা বলতে পারেন। যুবরাজের অনিদ্রা, মহামন্ত্রীর উদরাময়। আমি রাজবৈদ্য—এঁদের তো আমাকে দেখতেই হবে।"

"আপনি সত্যই নমস্য। যুবরাজকেও এর মধ্যে ধরে ফেলেছেন!"

জীবক একটু হেসে প্রস্থানের জন্য উদ্যত হলেন।

রত্নশ্রেষ্ঠী চেঁচিয়ে বললেন—"আজ যা হয় করুন। কপিলবাস্তু যদি যাওয়া হয়, আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে। যুবরাজের কাছে অনুমতি চেয়ে নেবেন।"

* * *

জীবক গৃহে ফিরে শুনলেন বন্ধকে নিরাময় করার কাহিনী সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে। শার্দুল প্রথম ছুটে এলো। "কুমার ভৃত্য, তুমি নাকি প্রভুর চরণ থেকে সাপের দাঁত তুলেছ?"

"সাপের দাঁত? কি বলছিস শার্দুল? এই দ্যাখ—এটা খেজুর কাঁটা।" জীবক কাঁটাটা দেখালেন।

"ওমা, তাইতো। লোকে যে কি বলে!

কালান্তক বেণুবন সাপের আড্ডা ছিল তো। তাই তো নাম 'কালান্তক'। তাই বোধ হয় রটেছে প্রভুর পায়ে সাপের দাঁত ফুটেছে। যাক্। ওপরে যাও। কুমারঅমাত্য তোমার জন্য না খেয়ে বসে আছেন।"

"সেকি! রোগী মানুষ। না খেয়ে আছেন? তোদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?"

জীবক লাফ দিয়ে সোপান উত্তীর্ণ হয়ে অভয়ের কক্ষে প্রবেশ করলেন। অভয় প্রসন্ন মুখে বললেন—"বৎস।"

"পিতা, আপনি এখনো খান নি?"

কিন্তু ততক্ষণে অভয় উঠে এসে জীবককে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। পুত্রের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—"সার্থক। সার্থক। সার্থক তোমার শিক্ষা।"

* * *

কয়েক দিন পর।

জীবক জটামাংসীর রস দিয়ে কয়েকটি বড়ি তৈরি করছিলেন যুবরাজের অনিদ্রা মোচনের জন্য। সোমপ্রভা এসে জানালেন—"রাজকন্যারা জীবকের কাছে এসেছেন। প্রসাধনকলা বিষয়ে তাঁদের কিছু প্রশ্ন আছে।" অভয়ও সেই সময় কক্ষে এলেন ও বললেন—"তুমি ওদের সরিয়ে দাও। প্রসাধনের ব্যাপরে জীবক কি জানে? ও তো সৈরিন্ধ্রীদের ব্যবসা।"

জীবক মুচকি হেসে বললেন—"প্রসাধনকলা বিষয়ে কিছু কিছু জানি।"

অভয় বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—"তাহলে ওদের ডাক!"

তিনি কক্ষত্যাগ করলেন।

সোমপ্রভা রাজকুমারীদের ডেকে আনতে গেলেন। কক্ষের বাইরে রুনুঝুনু ধ্বনি, খিলখিল হাসি, ফিসফিস কথা। রাজকুমারীরা ঘরে প্রবেশ করলেন। মৈত্রিকা, ভদ্রা, নন্দা, শুভা। এদের মধ্যে মৈত্রিকা আর ভদ্রা সব থেকে চটপটে। তারাই কথা শুরু করলেন।

"কেশকে সুগন্ধি করব কি করে?"

জীবক বললেন—"ধূপের ধোঁয়া দিয়ে কেশ শুকোবেন। অগুরু, চন্দন, কস্তুরী দিয়ে ধূপ বানাবেন। কেশ বন্ধনের পর তাতে দেবেন সুগন্ধি ফুল—টগর, মল্লিকা, চাঁপা, বকুল।"

মৈত্রিকা আবার বললেন—"কেশ কি করে কালো রাখা যায়।"

জীবক হাসলেন—"এখনি কি দরকার? আপনার যৌবন তো শেষ হয় নি এখনো।"

"না হোক। জেনে রাখি। জরা তো একদিন সব গ্রাস করবেই। প্রভু তো তাই বলেন।"

জীবক বললেন—"ভৃঙ্গরাজ পাতার রস খুব ভালো। আরো

ভালো হরিতকীর কষ। হরিতকী থেকে চিত্রশিল্পীরাও কালো রঙ তৈরী করেন। যদি টাক পড়ে, তাহলে কনক ধুতুরার তেল প্রশস্ত।"

নন্দা প্রশ্ন করলেন—"গাত্র সুগন্ধির উপায় কি?"

"খুব যদি ঘাম হয় তাহলে চন্দন, কর্পূর আর বেনামূলের রস মিশিয়ে মাখবেন। মুখের লাবণ্য বাড়াতে চান? এক টুকরো অলাবু প্রতিদিন মুখে ঘসবেন। যৌবন ধরে রাখতে চান? এক টুকরো রসোনা প্রতিদিন খাবেন। অন্তযৌবনাও যদি রসোনা ঘৃতপক্ক করে প্রতিদিন খায় তার বাকি যৌবন যাবে না।"

সবাই কথা বলছিল—শুধু শুভাই চুপচাপ। জীবক আড়চোখে তাকিয়ে দেখে ভাবলেন—একেই কি সেদিন দেখেছিলেন সোপানে? দীর্ঘপক্ষ্ম চক্ষু—একটি কিশোরী মূর্তি। সুবর্ণ দ্যুতির ঝলক দিয়ে চলে গিয়েছিল।

জীবক প্রশ্ন করলেন—"আপনি কিছু বলছেন না কেন? আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।"

শুভার মুখে রক্তিম আভা। সোমপ্রভা বললেন—"তুমি যেদিন এলে, রাজকুমারী শুভা সেদিন এখানে ছিল। তুমি ওকেই দেখেছ।"

অন্য রাজকুমারীরা হেসে এ ওর গা টিপলেন। মৈত্রিকা বললেন—"শুভা, জিজ্ঞেস কর কত রকম টিপ হয়"। খোঁচাটা বুঝে শুভা মাথা নত করে রইলেন। জীবক ব্যাপারটা সামলে নিলেন। "টিপ অনেক রকম হয়, রাজকুমারী—চন্দন, কুঙ্কুম, সিন্দুর, খদির, অভ্র, কাজল, কাঁচপোকা। পাতা কেটে নক্সাও করা যায় নানা রকম।"

"খয়েরের আবার টিপ হয় নাকি?" ভদ্রা শুধালেন।

"হয়। বৈশালীর মেয়েরা খুব বেশী খয়েরের টিপ পরে—পাশে আঁকে শ্বেত চন্দনের পত্রলেখা। জমকালো দেখায়। তাতে যদি অভ্র মেশানো হয়, হীরের মত জ্বলে। আমার কাছে অভ্র মেশানো খয়ের আছে—নিয়ে যান। ব্যবহার করুন।"

জীবক বললেন নন্দাকে কিন্তু ভাণ্ডটি দেলেন শুভাকে। একটা চাপা হাসির লহর তুলে, 'আবার আসব' বলে, বিদায় নিলেন রাজকুমারীরা। খদির ভাণ্ড দিতে গিয়ে শুভার আঙুলের সঙ্গে জীবকের আঙুল ঠেকে গিয়েছিল। তারই মদিরতায় জীবক কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। বারবার মনে উদিত হতে লাগলো শুভার শান্ত সংযত লজ্জারুণ মুখ। তারপর নিজেকে সজোরে সজাগ করে তুললেন জীবক। "ছি! ছি! কি ভাবছি? আমি না বুদ্ধের শিষ্য।" স্মরণ করলেন বুদ্ধবাণী—

"রমণীর রূপে মুগ্ধ যে জন, দেহ সম্ভোগকারী,
আয়ত্তহীন ইন্দ্রিয় যার, অলস অমিতাচারী,
সারহীন তরু ঝঞ্ঝায় যথা ধুলায় লুটায়ে পড়ে,
মার অসি ধরে সে হীনবীর্যে অতি অবহেলা ভরে।"

জীবক নিজেকে বাধ্য করলেন যুবরাজের বটিকা তৈরিতে মন সন্নিবেশ করতে। হঠাৎ কার ছায়া?

একটি সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এলো—"আমি রঙ্গনায়কী—যুবরাজ্ঞী।"

অজাতশত্রুর পত্নী! জীবক সহসা দেখলেন এক অপরূপা রূপসী—কিন্তু কি এক দুঃখভারে বিষণ্ন—চোখে জল টলমল করছে। পেছনে সোমপ্রভা—ওষ্ঠে আঙুল তুলে সতর্ক করে দিলেন, "সাবধানে কথা বোলো।" জীবক সমীহের সঙ্গে তাঁকে বসার আসন এগিয়ে দিলেন। নায়কী উষ্মাভরে বললেন—"আমি বসতে আসি নি। বিপন্ন—শরণার্থী।"

জীবক বিস্মিত—"কি বিপদ?"

কোলের নিদ্রিত পুত্রকে দেখিয়ে নায়কী বললেন—"একে রক্ষা করতে হবে।"

"এর কি কোন অসুখ হয়েছে?"

"অসুখ হবে কেন?"

"তবে? বৈদ্যের কাছে এনেছেন কেন?"

"তাহলে খুলেই বলি। আমি তো মা। সন্তানের জন্য ব্যাকুল তো আমি হবই। একে, এই উদয়ভদ্রকে' সিংহাসনে বসাতে হবে।"

জীবক কিছুক্ষণ হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। নায়কীকে তাঁর মনে হলো ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। মুখে বললেন—"এ রাজা হবে? সে তো বিশ পঁচিশ বছর পরে। এখনো সিংহাসনে রাজা বিম্বিসার বসে আছেন। তারপর যুবরাজ অজাতশত্রু। তারপর তো উদয়ী। আপনি অনর্থক চিন্তা করবেন না। সব হবে। এই দেখুন বটিকা তৈরি করছি যুবরাজের অনিদ্রা মোচনের জন্য।"

"উত্তম। আমার অনিদ্রা দূর করবেন না?"

"নিশ্চয় করব।"

"আমার কিন্তু ঐ বটিকায় হবে না।"

"উদয়ীকে সিংহাসনে বসালে হবে?" জীবক হাসলেন।

"আপনি হাসছেন? তবে জেনে রাখুন, বিম্বিসার আর সিংহাসনে বেশী দিন নয়। যুবরাজ সিংহাসনে বসলে সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে। আমার উদয়ীর কি হবে?" মুখে আঁচল দিয়ে রঙ্গনায়কী কেঁদে উঠলেন।

"অকারণ কেন শোক করছেন, বধূরাণী? উদয়ী বৈধ পুত্র। সে রাজা হবেই। তখন যদি আমার কোন সাহায্য লাগে নিশ্চয় করব। কিন্তু বধূরাণী, আমি তো মন্ত্রী নই, সেনাপতিও নই। আপনি বরং এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন।"

নায়কী বললেন—"আপনি তো একজন সভাসদ। জনমত তৈরি করতে পারেন। যুবরাজের কানে কথাটা তুলতে পারেন। জানেন তো রাজাদের কত গূঢ়পুত্র থাকে। উদয়ীর বদলে তাদের কাউকে তো সিংহাসনে বসাতে পারে। এই তো, আপনিই তো রাজা বিম্বিসারের গূঢ় পুত্র।"

"রাজা বিম্বিসার !!!" জীবক স্তম্ভিত।

"হ্যাঁ। বিম্বিসার আপনার পিতা। আপনি আমার দেবর। উদয়ীর খুল্লতাত।"

"তবে আমার মা কে?"

"আপনার মা সুবর্ণশ্রেষ্ঠীর স্ত্রী। পরম রূপসী। রাজগৃহের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। তার নাম মণিমালিনী। সাকেতে আপনি যে বণিকপত্নীকে রোগমুক্তা করেন, ইনি তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী।"

"এ কি সত্য?" জীবক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। নায়কী আড়চোখে জীবকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন।

অনেকক্ষণ পর জীবক বললেন—"আমি অধম ছিলাম। আপনি আমাকে অচল করলেন। আমি যাই হই না কেন নিজেকে চিরদিন রাজভৃত্যই ভাবব। মা যেই হোক না কেন প্রভুই আমার পিতা-মাতা।"

"আপনি রাজকুমার এটা জেনেও আপনার আনন্দ হচ্ছে না?"

"না। গৃহী হয়েও অন্তরে আমি ভিক্ষু। কুমার নই—কুমার-ভৃত্য। আর্যে, আমি এবার যুবরাজের কাছে যাব।"

"যান। সংকেত শব্দ—'কিঞ্জল্ক'—মনে রাখবেন। তাহলে দ্বারীরা দরজা খুলে দেবে।"

* * *

অজাতশত্রুর ভবন—অংজ সরোবরের উত্তরে। জীবক সংকেত-বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারী দরজা খুলে দিল। প্রহরীর পিছনে জীবক অজাতশত্রুর কক্ষে প্রবেশ করলেন। অমনি একজন শ্রমণ সহসা উঠে অন্তর্ধান করলেন। ভাল করে তাঁর মুখ দেখা গেল না। অজাতশত্রু পালংকে অর্ধশায়িত। সম্মুখে নানা রকম সুরা—মৈরেয়, মাধ্বী, কোহল। পাশে উন্মুক্ত অসি। জীবক দেখলেন বাঁকা হাতটি তিনি একটি উত্তরীয়ে ঢেকে রেখেছেন। অজাতশত্রু মাধ্বী পান করতে করতে বললেন—"কে? মিত্র জীবক?"

"আমি জীবক। আপনার ঔষধ এনেছি। এই দশটি বটিকা রাখুন। প্রতি রাত্রে নিদ্রার পূর্বে একটি করে খাবেন।"

অজাতশত্রু তাঁর রক্তিম চক্ষু তুলে বললেন—"খাব? বিষ বটিকা নয় তো?"

"এ কি বলছেন, যুবরাজ? আমি বৈদ্য। প্রাণদান আমার কাজ। প্রাণ হরণ নয়। আপনাকে হত্যা করে আমার কি লাভ?"

"কেন? রাজ্য?"

"আমি রাজভৃত্য।"

"কে বলল তুমি রাজভৃত্য? তুমি রাজপুত্র।" অজাতশত্রু তির্যক ভাবে তাকালেন।

এক্ষণে জীবকের কাছে সব সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন যুবরাজ যুবরাজ্ঞী উভয়েই তাঁকে পরীক্ষা করছেন। জীবক মনে মনে হাসলেন। উচ্চাশা যে তাঁর নেই তা নয়। তবে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবেন এমন নির্বোধও তিনি নন। মুখে বললেন—"রাজ্যে আমার কোন লোভ নেই, কুমার। তাহলে তো আমি যুদ্ধ বিদ্যাই শিখতাম। আয়ুর্বেদ শিখলাম কেন? মানুষের দেহের দুঃখ দূর করাই আমার বৃত্তি।"

"মিত্র জীবক, সত্য বলছ? তোমার মৈত্রীতে আমি বিশ্বাস করতে পারি?"

"পারেন।"

অজাতশত্রু বুকটা দেখিয়ে বললেন—"এখানে বড় জ্বালা। ঘুমোতে পারি না।"

"কুমার, কেন জ্বালা?"

"সব সময় মনে হয় রাজা হতে বুঝি পারবো না। কেউ চক্রান্ত করছে।"

"কোন চক্রান্তের সংবাদ কি পেয়েছেন?"

"না। আমার মত দক্ষ প্রশাসকের দৃষ্টি এড়ায় না কিছুতেই।

জানো তো বিম্বিসারের অনেক গুঢ়পুত্র আছে—তার মধ্যে সব থেকে প্রতিভাবান হলে তুমি ও অভয়।”

“যদি আমাদের জন্য আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তাহলে জানাই, আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেন। আমরা দুজনেই বুদ্ধশিষ্য। রাজ্যে আমাদের কোন লোভ নেই।”

“সত্য বলছো?” অজাতশত্রু হঠাৎ দুমড়ে শুয়ে পড়লেন, “জ্বালা···জ্বালা···।”

জীবক এসে বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তণ্হার (তৃষ্ণা) জ্বালা যে কি নিদারুণ তা দেখলেন। ভদন্ত এই জন্যই তো বলেন—বিষয় বিষ। রাজকুমারকে দেখে জীবকের কষ্ট হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে অজাতশত্রু উঠে বললেন—“বড় নরম তোমার হাত। বড় আরাম—তুমি আমায় শান্তি দিলে। আমি তোমার দেওয়া বটিকা খাব। অনেকদিন পরে ঘুমোতে পারবো। জীবক, তোমাকে বিশ্বাস করলাম।”

জীবক আবার বললেন—“কুমার, আপনি আমাকে রাজভৃত্য ভাববেন।”

“ভৃত্য নয়, মিত্র। তোমাকে আমি রাজমিত্র ভাবব।”

“বেশ, তাই।”

জীবক এবার বিদায় নিতে চাইলেন।

অজাতশত্রু বাধা দিলেন—“এখুনি? রাত্রি তো সবে তরুণী।”

জীবক বললেন—‘মহামন্ত্রীর উদরাময়। তাঁকে ঔষধ দিতে হবে।”

অজাতশত্রু বিরক্তি প্রকাশ করলেন—“আঃ! মহামন্ত্রীর উদরাময় আর শেষ হয় না। এদিকে পলান্ন, মেষমাংস, ক্ষীর খেয়েই চলেছেন।”

“এইজন্যই তো শাস্তা মিতাহারী হতে বলেন।”

শাস্তার কথা শুনে অজাতশত্রু একটু হাসলেন, বললেন,—

"আচ্ছা, জীবক, সত্যিই কি তোমার শ্রমণ গৌতমকে মহামানব বলে মনে হয় ?"

"মহামানব কি বলছেন, উনি দেবতায় চেয়েও বড়। যে দুঃখী মানুষকে নতুন আশার পথ দেখাতে পারে তার চেয়ে বড়ো আর কে আছে ?" জীবক চোখ বন্ধ করে বললেন— "তিনি অনন্তপুণ্য !"

অজাতশত্রু এবার আর হাসলেন না। একটু চিন্তিত মুখে চেয়ে রইলেন। জীবক বিদায় নিলেন।

* * *

ভৌমবার।

রাজসভার কাজ শেষ করে জীবক সবে গৃহে ফিরেছেন। তাঁর মনে খুব আনন্দ। প্রভু কপিলবাস্তু জয় করে মাসখানেক হলো ফিরেছেন। বহু শাক্য রাজপুত্র ভিক্ষু হয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করেছে। বুদ্ধ-উদ্যোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহে ফিরে শুনলেন সারিপুত্র তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। জীবক বললেন—"ধর্মসেনাপতি, আপনি স্বয়ং ? আমাকে ডেকে পাঠালেই তো পারতেন।"

"আপনি সঙ্ঘ-মিত্র। তাই এলাম। ডেকে পাঠালে তো গুহ্য কথাটা বলা হোত না।"

"বলুন।"

"আপনি তো কপিলবাস্তু গেলেন না। কিন্তু গেলে ভাল করতেন।"

"কেন ?"

এমন সব ব্যাপার ঘটল যে সামলানো গেলো না। আপনি গেলে হয়তো কিছুটা ঠেকানো যেত।"

"কিরকম ? ব্যাপারটা বিশদ করে বলুন।"

"সংক্ষেপে বলি, 'সুখ সঙ্ঘস্‌স সামগগী'—সঙ্ঘ মানে ঐক্য। এই ঐক্যে ফাটল ধরতে চলেছে।"

জীবক জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন। মুখে কথা বললেন না।

সারিপুত্র ম্লানমুখে বললেন—"প্রভুর এক জ্ঞাতিভ্রাতা এসেছেন—নাম দেবদত্ত। এসেই দলাদলি শুরু করেছেন।"

জীবকের সহসা মনে হলো, অজাতশত্রুর কক্ষে কি দেবদত্তই ছিলেন? তিনি অবশ্য তাঁর মুখ দেখতে পান নি। প্রশ্ন করলেন—"তিনি এলেন কি করে?"

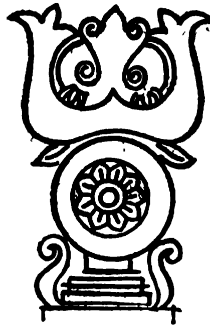
"আপনি তো জানেন মহারাজ শুদ্ধোদন বারবার প্রভুকে ডেকে পাঠাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাঘের শেষে আমরা কপিলবাস্তু গেলাম। জানেন তো কালুদায়ী প্রভুকে কি তোষামোদ করেই না নিয়ে গেল। বলল—এখন শীতের শেষ। রাজগৃহ থেকে কপিলবাস্তু যাবার পথটি খুব সুন্দর। গাছে গাছে ফুল। ফুলে ফুলে প্রজাপতি। প্রভু তো বুদ্ধিমান তথা রঙ্গপ্রিয়। বললেন—'কালু, এ কয়দিনে তুমি ধ্যানী তো হয়েইছো, আবার কবিও হয়েছো?' কালুও পরিহাসপ্রিয়। সে জবাব দিলে—'তোমার কাছে থেকে ভিক্ষু হয়েছি, ধ্যানী হয়েছি, আরও কত কি হবো কে জানে?'

প্রভু হেসে বললেন—'সত্যি কথাটা বলতো।'

'একটিবারের মত কপিলবাস্তু চল। মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছেন। একটিবারের মতো পুত্রমুখ দেখতে চান।'

প্রভু বললেন—'যাব।'

আমরা সকলে গেলাম।



দিনটি ফাল্গুনী পূর্ণিমা। বুদ্ধের জন্মতিথি ও উৎসব।

কপিলবাস্তুর উপকণ্ঠে ন্যগ্রোধারাম ভবনে উঠলাম। স্থানটি সুন্দর। চারিদিকে উপবন। কোকনদ সরোবর, পুণ্ডরীক সরোবর দুটি বৃহৎ জলাশয়। দূরে হিমবন্ত পর্বতের বরফে ঢাকা শ্বেতশীর্ষ।

প্রভুকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শাক্যরা শোভাযাত্রা করে এলেন। প্রথমে শিশুরা—তারপর তরুণেরা—তারপর বয়স্করা। পুষ্প মাল্য গন্ধদ্রব্য নিয়ে। রাজা শুদ্ধোদনের মাথায় মাণিকের মুকুট—কপালে রক্তচন্দনের তিলক—পরণে রক্তচেলী—পাশে ছত্রধর, দণ্ডধর, মন্ত্রী, সান্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে নবরত্নের মালা। সেনাপতির বক্ষে বর্ম, হাতে তরবারি। তারপর এলেন রাজভ্রাতারা—শুক্লোদন, অমৃতোদন, দ্রোণোদন, ধৌতোদন। রাহুলমাতার পিতা সুপ্রবুদ্ধ, তাঁর ভাই দণ্ডপাণি। নন্দ, আনন্দ, রাহুল।

প্রভু চমৎকার উপদেশ দিলেন।

প্রথমে বোঝালেন দুঃখ কি। তারপর বললেন—'দুঃখের মূল তৃষ্ণা (তণ্হা)। তৃষ্ণা জয় কর, তাহলে বার বার এই দুঃখময় জগতে আসতে হবে না।' শাক্যরা তো খুব বিষয়ী। তাই তিনি বার বার বললেন—'বিষয়ই বিষ'। উনি মুখে মুখে পদ্য রচনা করতে পারেন, জানেনতো ? তাই আবার বললেন—

'বিষয় বিষের পুষ্প চয়নে যে জন ভুলিয়া থাকে,
ঘুমন্ত গ্রামে বন্যার মত যম আসি ধরে তাকে।'

শুদ্ধোদনের দিকে তাকিয়ে বললেন—

'উত্থিত হও, প্রমাদে কখনো হোয়ো নাকো উন্মুখী,
কল্যাণ-কর ধর্ম আচরি, উভলোকে হও সুখী।'

শাক্যধনীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

'ঘুমন্ত গ্রাম সহসা যেমন বন্যা প্লাবনে ভাসে,
বিষয়ীজনের পুত্র ও পশু মৃত্যু তেমনি গ্রাসে।
উৎখাত কর তৃষ্ণার মূল : সমূলে খনন কর।
ছিন্ন বৃক্ষ অঙ্কুরে পুনঃ, অখণ্ড মূল যার।
সমূলে তৃষ্ণা না করিলে নাশ, জনমে বারংবার।'

প্রভুর কথা শুনে তো সভা নিস্তব্ধ। শাক্যরা তো এই যব, এই তিল, এই মুগ নিয়ে থাকে। হঠাৎ চতুঃসত্য শুনে, তৃষ্ণার কথা শুনে, নির্বাক। মাথা নীচু করে একে একে উঠে চলে গেল। কেউ প্রভুকে আহারের জন্য আমন্ত্রণ করলো না। প্রভুর মুখ ম্লান হয়ে গেলো। আমাকে ডেকে বললেন—'কাল থেকে আমরা ভিক্ষায় যাব।'

আমি বললাম—'যে আদেশ, প্রভু।'

পরদিন সকালে আমরা ভিক্ষায় বেরোলাম। কপিলবাস্তু নগরটি বেশী বড় নয়। নগরের মধ্যস্থলে প্রশাসন গৃহ। তাকে বলে 'সংস্থাগার'। এর পর শুদ্ধোদনের প্রাসাদ। তারপর রাজভ্রাতাদের প্রাসাদ। প্রভু শ্রেষ্ঠীভবনে ভিক্ষা চাইছেন। আমি পেছনে আছি, মোগ্গলায়ন এবং পঞ্চবর্গীয়রাও আছে। মহানাম তো শাক্য বংশীয়—সে কোন সময়ে গিয়ে মহারাজকে সব বলে এসেছে।

হঠাৎ দেখি মহারাজ শুদ্ধোদন কোমরে কাপড় বাঁধতে বাঁধতে ছুটে আসছেন। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'সিদ্ধার্থ, ভিক্ষা করছ? তুমি না অভিজাতবংশীয়?

প্রভু বললেন—'আমি অভিজাত নই। আমি ভিক্ষু। আমি বুদ্ধবংশীয়। ভিক্ষাই আমার জীবিকা।'

শুদ্ধোদন মাথায় করাঘাত করে বললেন—'হায়রে ভাগ্য! যার এত ক্ষেত্র, এত শস্য, ভিক্ষাই তার জীবিকা!'

রাজপথে ততক্ষণে লোক জমে গেছে। পিতা-পুত্রের বিতর্ক শুনতে সবাই উন্মুখ। বুদ্ধ ভিক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন, বলছেন—

'যে দাতা সে আসক্তিহীন হয়ে দেয়।
যে প্রার্থী সে অহংহীন হয়ে নেয়।
অম্লান রাখি বর্ণ গন্ধ ফুলে মধু খায় অলি,
সেই মত গৃহে ভিক্ষা লভিয়া মুনি দূরে যান চলি।'

ইতিমধ্যে মহাপ্রজাবতী এসে দাঁড়িয়েছেন বহির্দ্বারে। তাঁকে দেখে শুদ্ধোদন বিতর্ক থামিয়ে বললেন,—'পুত্র, দেখ, তোমার কাণ্ডে তোমার মা এসেছেন বহির্দ্বারে।'

প্রভু তো রঙ্গপ্রিয়। হাসতে হাসতে প্রাসাদে প্রবেশ করে বললেন—'আপনি কি কাল আমাকে আহারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?'

শুদ্ধোদন চোখ কপালে তুলে বললেন—, 'পুত্রকে পিতা নিমন্ত্রণ করবে? এই তোমার ধর্ম নাকি? এই গৃহ কি তোমার নয়? এখানের অন্নে কি তোমার শরীর বর্ধিত হয় নি?'

প্রভু আর কথা বললেন না। মহাপ্রজাবতী পুত্রের মুখচুম্বন করলেন। মেয়েরা এসে তাঁর পা ধুইয়ে দিল। পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করলো। তারা এসে আমাদের পাও ধৌত করল।

প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেখা গেল অফুরন্ত এক উদ্যান। গাছের পর গাছ। তলায় সবুজ ঘাস। মধ্যে বিশাল এক পদ্ম সরোবর—তাতে পদ্ম ফুটে আছে। হাঁস ভাসছে। সরোবরের ধারে হরিণ চরছে। বাতাসে মিষ্টি ফুলের গন্ধ। ওপরে নীল আকাশ। আর একদিকে এক চন্দ্রাতপ। শাক্যরমণীরা সেখানে শ্রমণদের জন্য রন্ধন করছেন। থরে থরে পাত্র সাজানো হচ্ছে।

শাকান্ন, পলান্ন, পরমান্ন, মুদ্গ, সুপরস, লড্ডুক, খড্ডুক। শাক্যরমণীদের সঙ্গে মহাপ্রজাবতীও রন্ধন করছিলেন।

সুসজ্জিত কক্ষে সুখদ আসনে পুত্রকে বসালেন মহাপ্রজাবতী। আত্মীয়ারা দলে দলে এসে ভিড় করলো। ধূপ জ্বললো, দীপ জ্বললো। মহিলারা বললেন—'এবার আমাদের ধর্ম উপদেশ শোনাও।'

প্রভু তো রঙ্গপ্রিয়। তারপর এখানে সকলেই তাঁর আত্মীয়া। তাই তিনি বললেন—'আগে আহার্য দান কর। তারপর ধর্মদান করব। কেন জানো?

সর্বদানের পরাভব ঘটে সতত ধর্মদানে
ধর্মের রস সর্বরসের পরাভব সদা আনে।
নিদারুণ দুখ জয় করা যায় তৃষ্ণার অবসানে।'

এমন সময় এক মহিলা এসে বললেন—'রাহুলমাতা কিছুতেই আসছে না। সে বলছে, আমার যদি কোন মূল্য থাকে তবে তিনিই আসবেন আমার কছে।'

মেয়েরা সবে গালে হাত দিয়ে বলতে যাচ্ছিল 'কি আস্পর্ধার কথা!' প্রভু সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'রাহুলমাতা যথার্থ কথাই বলেছেন। আমিই যাব তাঁর কাছে। সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন, চলতো তাঁকে দেখে আসি।'

আমরা অবাক। প্রভু যাচ্ছেন পত্নীকে দেখতে। এ তো নিভৃত ব্যাপার। সেখানে আমরা কেন? তখন বুঝিনি প্রভুর তো আর দাম্পত্যবোধ নেই। পত্নী বটে কিন্তু তিনি তোঁ পূর্বজন্মের পত্নী। প্রভু সন্ন্যাসী। তাঁর পক্ষে রমণীদর্শনও অন্যায়। তাই তিনি আমাদেরও নিয়ে চলেছেন।

প্রভু কক্ষে প্রবেশ করলেন।

বারো বছর আগে তিনি এই কক্ষ থেকেই মহাভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন। শূন্য কক্ষ। একটি মাত্র গজদন্ত নির্মিত আসন—

তার উপর হরিণের ছাল পাতা। প্রভু বসলেন। হঠাৎ তীরের মত ছুটে এসে এক রমণী তাঁর পায়ের উপর পড়লেন। রক্তপদ্মের মত সুন্দর দুটি চরণ মাথার উপর তুলে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমরা তো সন্ন্যাসী—নির্মোহ, নির্মায়িক। কিন্তু আমাদেরও চোখে জল এসে গেল। প্রভু নির্বিকার। ধ্যানমগ্ন। সবাই নির্বাক।

একটু পরে শুদ্ধোদন বললেন—'রাহুলমাতার পাতিব্রত্য ধর্মের তুলনা নেই, পুত্র। যেদিন থেকে তুমি চলে গেছ, সেদিন থেকে সেও সন্ন্যাসিনী। ভূমিশয্যা—একাহার—প্রসাধন ত্যাগ। কেশ কেটে ফেলেছেন—অলঙ্কার ত্যাগ করেছেন। শুধু চীবরটি পরেন নি।'

প্রভু তাঁর পদ্মের মত দুটি চোখ তুলে বললেন—'রাহুলমাতা যথার্থ কাজই করেছেন।'

রাহুলমাতা সহসা উঠে চারদিকে বহু লোক দেখে লজ্জিত হয়ে অবগুণ্ঠন টেনে সকলের পশ্চাতে চলে গেলেন।"

জীবক প্রশ্ন করলেন—"রাহুলমাতা কি খুব সুন্দরী?"

সারিপুত্র বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—"এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি দেখলাম। জীবক, প্রশ্ন করছেন তিনি সুন্দর কিনা? আমি তো তা দেখি নি। আমি তো সৌন্দর্য দেখিনি, জীবক। কিন্তু দেখলাম মাধুর্য, দেখলাম মহাপ্রেম। সে কি এমন নিঃশেষে বিলীন হওয়া!"

জীবক বললেন—"তারপর?"

"প্রভু উঠলেন। হাতে তুলে নিলেন একটি শ্বেতপদ্ম। রাহুল মাতাকে একটি জাতকের গল্প শোনালেন—সে তাঁর পূর্ব জন্মের কথা। তারপর বললেন—

'অষ্টমার্গ চতুঃসত্য সম্যকরূপে জানো।
আপদবিহীন এ মহাশরণ উত্তম বলে মানো।'

পূর্বজন্মের পত্নীকে এই উপদেশ দিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

মহাপ্রজাবতী আমাদের পাঁচশত ভিক্ষুকে নিয়ে এলেন ভোজন-শালায়। সেখানে তিনি ও শুদ্ধোদন স্বহস্তে ভিক্ষুদের পরিবেশন করলেন নানা রকম সুখাদ্য। মহাপ্রজাবতী খুবই খুশি। পরের দিন তাঁর পুত্র নন্দের বিবাহ এবং অভিষেক হবে। এই শুভ কাজে বুদ্ধও এসেছেন। তাই আনন্দ দ্বিগুণ।

বুদ্ধকে তিনি তাঁর নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। বুদ্ধ যখন সংসার ত্যাগ করেন—ছন্দকের মুখে শুনে তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠে বুদ্ধের পাঠানো অলঙ্কারগুলি পদ্মসরোবরে ছুড়ে ফেলে দেন। মায়াদেবী যেদিন সন্তান প্রসব করেই প্রয়াণ করেন, সেদিন সেই মাতৃহারা শিশুকে তিনিই কোলে তুলে নেন। নন্দ তো তখনো গর্ভে। তাঁর প্রথম স্তনদুগ্ধ তো সিদ্ধার্থই পান করেছিল। তারপর নন্দ হলো। দুই পুত্রকে দুই স্তন দুগ্ধ খাইয়ে তিনি বড় করেছেন।

ভোজনকালে বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি নন্দের হাতে দিলেন। বুদ্ধ ভোজন শেষ করলেন কিন্তু ভিক্ষাপাত্রটি ফিরিয়ে নিলেন না। তারপর সমাগত সকলকে ধর্ম উপদেশ দিলেন। জরা সম্বন্ধে বিশেষ করে বোঝালেন। মহিলারা ছিলেন বলেই বোধহয় দেহের নশ্বরত্ব বেশী করে বললেন। তারপর ন্যগ্রোধারাম চলে গেলেন। নন্দও ভিক্ষাপাত্রটি হাতে পিছনে পিছনে চলল। ভয়ে সে কিছু বলতে পারছিল না। কিন্তু তার বুদ্ধের সঙ্গেব যাবার ইচ্ছাও ছিল না। কি এক আকর্ষণে সে যাচ্ছিল। পথে বাঁক নিতেই, এক নারীকন্ঠের আকুল আহ্বান ধ্বনিত হলো—'নন্দ, রাজকুমার, কোথায় চলেছেন? ফিরে আসুন, ফিরে আসুন।'

তাকিয়ে দেখলাম, বাতায়নে একটি সুন্দরী কিশোরী অঝোরে কাঁদছে। কে এই মেয়েটি? মহানাম বলল—'নন্দের ভাবী স্ত্রী। মেয়েটির নাম জনপদকল্যাণী।'

কল্যাণীর আহ্বানে নন্দ বিচলিত হলো কিন্তু ভয়ে পিছনে

ফিরতে পারলো না। প্রভু কিন্তু ধীর পদক্ষেপে চলতেই লাগলেন। ন্যগ্রোধারামে পেঁছে আমাকে ডেকে বললেন—'সারিপুত্র, নন্দকে উপদেশ দাও।'

আমি নন্দকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলাম এবং চতুঃসত্য বর্ণনা করলাম। কিন্তু নন্দ আনমনা—কিছুই শুনছে না। বুঝলাম সে কল্যাণীকে ভুলতে পারছে না। মুখ শুকিয়ে গেছে—বিষণ্ন মূর্তি। একে কি উপদেশ দেব? আমি প্রভুকে সব বললাম।

প্রভু নন্দকে খুব স্নেহ করেন। একই মায়ের দুধ খেয়ে দুজনে মানুষ। তার উপর নন্দের সঙ্গে প্রভুর রঙ্গের সম্বন্ধ, কালুদায়ীর মত। প্রভু নন্দকে ডেকে বললেন—'নন্দ, তুমি কি জনপদকল্যাণীকে খুব ভালবাস?

নন্দ বলল—'খু-উ-উ-ব।'

'কেন?'

'অমন সুন্দরী আমি দেখি নি।'

'ওর চেয়ে সুন্দরী নেই?'

'না।'

প্রভু বললেন—'চল আমার সঙ্গে।'

নগর পার হয়ে তাঁরা বনের মধ্যে গেলেন। বনের একটি দিকে দাবদাহে পুড়ে গেছে। সেখানে একটি মৃতা বানরী পড়ে আছে। প্রভু ঋদ্ধি বলে সেখানে এক অপরূপ অপ্সরার আবির্ভাব ঘটালেন। তার সৌন্দর্য দেখে নন্দ অভিভূত।

প্রভু বললেন—'নন্দ, তুমি একে বিবাহ করবে?'

নন্দ বললো—'হ্যাঁ, ভদন্ত।'

'এ কি কল্যাণীর চেয়ে সুন্দরী?'

'এর সঙ্গে তুলনায় কল্যাণী ঐ মৃতা বানরীর মতো।

প্রভু এই চেয়েছিলেন। কল্যাণীর সম্বন্ধে নন্দের মোহভঙ্গ

হোক। তাই হলো। এবার উনি বললেন—'অপ্সরাকে পেতে গেলে আমার কথা শুনতে হবে।'

'ভদন্ত, শুনব।'

ন্যগ্রোধারামে ফিরে প্রভু বললেন—'সারিপুত্র, একে দীক্ষা দাও।'

পরদিন সকালে আমি নন্দকে চীবর দিলাম। সঙ্ঘে এদিকে রটেছে নন্দ অপ্সরার জন্য তপস্যা করছে। এ নিয়ে ভদ্র আর বপ্র—দুই পঞ্চবর্গীয়—নন্দকে পরিহাস করতে লাগলো। নন্দ তো লজ্জিত। প্রভুকে গিয়ে বলল—'আমার ভুল হয়েছে। আমি প্রকৃত শ্রমণ হতে চাই। অপ্সরা পেতে চাইনে।'

প্রভু স্মিত হেসে বললেন—'এত দিন তুমি ছিলে অভাবিত চিত্ত। এখন থেকে হলে সুভাবিত চিত্ত। কি ছিলে জানো?

যে গৃহের চালা অতি অযতনে অবহেলাভরে বাঁধা
রোধিতে পারে না সে গৃহ কখনো বর্ষার জলধারা।
অযতনে বাঁধা চিত্ত তেমনি শোভন-চিন্তাহারা,
রোধিতে পারে না, বহে যবে বেগে কামনার খরধারা।

তোমার অযতনে বাঁধা গৃহ এখন সুন্দর ছাওয়া হয়েছে। তুমি এখন হয়েছ—

যে গৃহের চালা দৃঢ়ভাবে বাঁধা অতি সাবধানে ছাওয়া,
প্রতিরোধ করে সে গৃহ সতত বর্ষার জল হাওয়া।
নিষ্ঠায় বাঁধা চিত্ত তেমনি মলিন চিন্তাহারা
প্রতিরোধ করে, বহে যবে বেগে কামনার খরধারা।'

ওদিকে প্রাসাদে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। জনপদকল্যাণী ক্রুদ্ধ হয়ে রাহুলমাতাকে অনেক কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন—

'এই তোমাদের মনে ছিল? রাহুলকে এইভাবে সিংহাসনে বসাবে। সে কথা বললেই পারতে। তার জন্য আমার ভাবী স্বামীকে শ্রমণ করা কেন?'

শুদ্ধোদনও বললেন—'পিতা-মাতার অনুমতি না নিয়ে শ্রমণ

করার কি অধিকার সিদ্ধার্থের আছে? আজ নন্দের অভিষেক হবার কথা। আর আজই তাকে চীবর দান?'

মহাপ্রজাবতী অবশ্য কিছুই বলেন নি। তিনি বুদ্ধগতপ্রাণা। তাঁর বক্তব্য,—নন্দ তো মহদাশ্রয়েই গেছে। বুদ্ধের কাছে গেছে। এতে ক্রোধের কি আছে? কিন্তু রাহুল-মাতা বিষণ্ণ।

পরের দিন প্রভু যখন ভোজন করতে গেলেন রাহুল-মাতা অন্তরাল থেকে রাহুলকে বললেন—'ঐ শ্রমণ তোমার পিতা।'

রাহুল বলল—'শ্রমণ কেন আমার পিতা হবেন? রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা।'

'না বৎস, শুদ্ধোদন তোমার পিতামহ। ঐ শ্রমণই তোমার পিতা। তুমি ওঁর কাছে পৈতৃক সম্পত্তি চাও।'

রাহুল বুদ্ধের কাছে গিয়ে শিশুসুলভ কণ্ঠে বললো—'শ্রমণ, শ্রমণ, তোমাকে কি সুন্দর দেখতে। তোমার গাত্রবস্ত্র কি সুন্দর উজ্জ্বল পীত। এটা আমাকে দেবে? দাও না।'

বুদ্ধ মৃদু হাসলেন। ভোজন শেষে সবাইকে উপদেশ দিয়ে যখন যাচ্ছেন—রাহুলও সঙ্গ নিল। পেছন পেছন আসতেই লাগলো। কেবলই বলছে—'শ্রমণ, আমাকে সম্পদ দাও।'

প্রভু আমাকে ডেকে বললেন—'সারিপুত্র, রাহুলকে দীক্ষা দাও।'

আমি বললুম—'এ যে শিশু।'

প্রভু বললেন—'তা হোক। একে চীবর দান কর।'

এই খবরে রাজার হৃদয়ে শেল বিঁধল। বুদ্ধ গেল; নন্দ গেল; রাহুলও গেল! রাহুল—রাহুল। রাহুল যে তাঁর প্রাণ। সেও ঘর শূন্য করে দিয়ে চলে গেল? এক অদম্য বেদনায় তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। শূন্য প্রাসাদ—শূন্য সিংহাসন—শূন্য রাজ্য। তবে আর কি রইলো? কাকে নিয়ে তিনি থাকবেন? অন্ধকার—চারিদিকে অন্ধকার। শুদ্ধোদন জ্ঞান হারিয়ে ভুলুণ্ঠিত হলেন।

হৈ চৈ উঠলো। সবাই ছুটে এসে ধরাধরি করে তাঁকে শয্যায় শুইয়ে দিল। ছুটে এলেন মহাপ্রজাবতী—ছুটে এলেন রাজবৈদ্য।

কিছুক্ষণ পরে রাজা উঠলেন। বললেন—'সিদ্ধার্থের কাছে যাব।'

মহাপ্রজাবতী বললেন—'আজ থাক।'

রাজা বললেন—'না, আজই যাব।'

প্রভুর কাছে এসে বললেন—'সিদ্ধার্থ, তুমি এ কি করলে? নন্দকে ভিক্ষু করলে। শেষে রাহুলকেও? সে তো শিশু, সন্ন্যাসের মর্ম কি বোঝে? এখন শত শত শাক্য যুবক ভিক্ষু হতে চাইছে। স্ত্রীকে ত্যাগ করে, মায়ের বুক খালি করে, সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে তারা ভাবছে ভিক্ষু হওয়া মজার ব্যাপার। এই দায়িত্বহীন যুবকদের নিয়ে তোমার সঙ্ঘই বা কি করে চলবে—আর সব যুবকই যদি ভিক্ষু হয় আমার রাজ্যই বা চলবে কি করে?

সিদ্ধার্থ, আমি স্পষ্ট দেখছি তোমার ধর্মের ফলে শাক্য রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন যে গৃহে শুধু শিশু আর রমণী থাকে দস্যু সে গৃহ লুণ্ঠন করে, যে রাজ্যে শুধু শিশু আর রমণী থাকে তার অবস্থাও তেমনি। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বৈশালী, কোশল সবাই প্রবল। তোমার ধর্মে কি গৃহীদের কোন স্থান নেই? গৃহীরাই তো তোমাদের অন্ন জোগায়—আহার্য দেয়—বাসস্থান দেয়। সবাই যদি শ্রমণ হবে তবে চাষ করবে কে? শস্য সঞ্চয় করবে কে? আহার্য প্রস্তুত করবে কে?

জবাব দাও। চুপ করে রইলে যে?'

প্রভু নতমুখে পিতার বক্তব্য শুনলেন। শুদ্ধোদন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন—'কথা দাও, পিতা-মাতার অনুমতি ভিন্ন তুমি কাউকে ভিক্ষু করবে না।'

প্রভু বললেন—'আমি আপনার এ কথা শুনব। তবে একটা কথা, জনপদকল্যাণীকে বলবেন, নন্দের অর্হত্ব লাভের সময় এসে গিয়েছিল। বিবাহ হলে অল্প দিনের মধ্যেই সে সন্ন্যাস নিত।

তাতে কল্যাণীর কি লাভ হোত? আমি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। সে এখন অন্য কোন শাক্য যুবককে বিবাহ করতে পারে।'

শুদ্ধোদন বিদ্রূপের সুরে বললেন—'কোথায় যুবক? সবাই তো তোমার সঙ্ঘে ভিক্ষু হয়েছে।'

প্রভু বললেন—'আপনি একশত যুবকের একটি তালিকা করে দিন। আমি শুধু তাদেরই সঙ্ঘে নেব।'

এমন সময় রাজভ্রাতা অমৃতোদন দ্রুতগতিতে প্রবেশ করে বললেন—'সর্বনাশ উপস্থিত। নন্দ ও রাহুল ভিক্ষু হওয়ায় আমরা ভদ্রিককে যুবরাজ করতে চেয়েছিলাম। সংস্থাগার থেকে তা ঘোষিতও হয়। এখন সে ভিক্ষু হতে চাইছে।'

কথা শেষ হতে না হতেই ছুটতে ছুটতে এলেন আর এক রাজভ্রাতা দ্রোণোদন। বললেন—'একশতজন যুবক মস্তক মুণ্ডন করে সব অলঙ্কার রাজ-ক্ষৌরকার উপালিকে দিয়ে চলে আসছিলেন। এমন সময় উপালি সব অলঙ্কার একটি উত্তরীয়ে বেঁধে এক গাছের ডালে ঝুলিয়ে তাদের সঙ্গ নিয়েছে। বলছে—সেও ভিক্ষু হবে।'

শুদ্ধোদন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'যে কেউ ভিক্ষু হবে? কোন নিয়ম নেই? এভাবে চললে শুধু রাজ্য কেন, সঙ্ঘও ধ্বংস হবে।'

প্রভু বললেন—'পিতা, আমরা কালই ফিরে যাব।"

সারিপুত্র বলে চললেন—

"পরদিন আমরা অনুপ্রিয় গ্রামে চলে এলাম। এখানে এসেও শান্তি নেই। একটু পরেই এসে উপস্থিত দেবদত্ত, আনন্দ, ভদ্রিক আর উপালি। অনুরোধ, উপরোধ, কাকুতি, মিনতি। কি? না তাদের দীক্ষা দিতেই হবে।

অগত্যা প্রভু দশবল কাশ্যপকে বললেন—'এদের দীক্ষা দাও।'

দীক্ষান্তে প্রভু বললেন—'সবাই সবাইকে নমস্কার কর।' সবাই কথা শুনলো। কিন্তু দেবদত্ত শুনলো না। সে উপালিকে নাপিত বলে নমস্কার করলো না।

প্রভু বললেন—'শ্রমণের আবার জাত কি ?'

দেবদত্ত তবু শুনলো না।"

জীবক বিস্মিত—"এ যে বিদ্রোহ।"

সারিপুত্র বললেন—"ঠিক। সঙ্ঘে এই প্রথম বিদ্রোহ। এখন সে সঙ্ঘের মধ্যে একটি উপদল গঠন করেছে। এরই মধ্যে যুবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। উপদলটির নেতা করেছে কোকিলাক্ষকে। রাজা শুদ্ধোদন ঠিক কথাই বলেছিলেন, যাকে তাকে ভিক্ষু করা উচিত নয়। একটা নিয়ম থাকা উচিত। চলি।"

সারিপুত্র উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে চলতে গিয়ে ফিরে এসে বললেন—"যা বলতে এসেছিলাম তা তো বলা হলো না। পরশু আমরা বৈশালী যাচ্ছি। বৃষ্টি না হওয়ায় সেখানে মড়ক শুরু হয়েছে। লিচ্ছবিনায়ক সিংহ তাই প্রভুকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাকেও যেতে হবে। রাজা বিম্বিসারেরও তাই ইচ্ছা। আর সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ।" জীবক মৃদু হাসলেন।

* * *

বৈশালী যেতে হবে। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। শকটে শকটে বোঝাই হচ্ছে চিড়ে, গুড়, গম, মুগ, কার্পাস তুলো, ঔষধ। রাজকুমারী শুভা এসে জীবককে বললেন—"আপনি তো যাচ্ছেন। আমাকেও নিয়ে চলুন।"

"আপনি গিয়ে কি করবেন ?" জীবক শুধালো। "আমি অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ। আমাকে কি তুমি বলা যায় না ?"

"বেশ।"

"কি করব, বলছেন ? তার উত্তরে বলি—সেবা। শাস্তা তো বলেন দশ কুশলকর্মের মধ্যে সেবা-ও একটি।"

"মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে দেখছি। সেখানে মহামারীতে লোকে পড়ছে আর মরছে। সেখানে যাবে তুমি ?"

"তাহলে আপনিও যাবেন না। আপনার যদি কিছু হয়?" শুভার কণ্ঠ করুণ।

"পড়ব আর মরব।" জীবক নির্বিকার। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন শুভার নয়ন দুটি জলে ভরে উঠেছে। তাহলে তাঁর জন্যও কাঁদার লোক আছে! জীবক একটু নরম হোলেন।

"কোন ভয় নেই, রাজকুমারী—আমরা সতর্ক থাকব। শাস্তা যাচ্ছেন সঙ্গে, ভয় কি?"

শুভার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। জীবক শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"আহা! কাঁদছ কেন? তুমি তো যেতেই পার। ওটা তো তোমার মাতামহগৃহ।"

এমন সময় অভয় কক্ষে এলেন। প্রশ্ন করলেন—"শুভা. কাঁদছ কেন?"

জীবক বললেন—"শুভা বৈশালী যেতে চাইছে।"

অভয় বললেন—"যাবে বৈকি। রোগটা একটু প্রশমিত হোক। আহা! বৈশালী কি সুন্দর জায়গা। ভদন্ত কি ভালবাসেন বৈশালী। বলেন, 'মর্তের স্বর্গ'। লিচ্ছবিরা নাকি দেবতার মত। যেমন রূপ তেমনি সুন্দর বসন-ভূষণ।"

জীবক বললেন—"পিতা, আপনি তো অনেকবার বৈশালী গেছেন—সে সম্বন্ধে একটু বলুন না।"

"তা গেছি। বৈশালী নগর তিন অংশে বিভক্ত। ষাট হাজার স্বর্ণচূড়া মণ্ডিত হর্ম্য—এখানে থাকেন অভিজাতরা। মধ্য অঞ্চলে চৌদ্দ হাজার রৌপ্যশীর্ষমণ্ডিত ভবন—এখানে থাকেন মধ্যবিত্তরা। শেষ অঞ্চলে তাম্রচূড়াযুক্ত একুশ হাজার গৃহ—এখানে থাকে সাধারণ লোক। বৈশালীতে তো গণতন্ত্র চলে। কিন্তু উচ্চবিত্তরা নিম্নবিত্তদের বিবাহ করে না। তবে নিম্নবিত্তের মেয়েদের উচ্চবিত্তরা বিবাহ করে। প্রশস্ত রাজপথ, মনোরম উদ্যান,

স্বচ্ছ সরোবর, পরিচ্ছন্ন উপবন—সব মিলিয়ে যেন একটি স্বপ্ন।"

শুভা ততক্ষণে কান্না থামিয়েছে। অভয় তার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে বলবেন—"যাবে বৈকি বৈশালী। এমন সুন্দর ভূখণ্ডে যাবে না? নিশ্চয় যাবে। আর তোমার মাতামহ সিংহই তো নায়ক। তোমার মায়ের পিতামহ সকল খুব দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। বিদেহের রাজমন্ত্রীও ছিলেন। তারপর কোন কারণে রাজার সঙ্গে কলহ হওয়ায় তিনি বৈশালী আসেন। সেখানকার নায়ক হন। আমাদের রাণীর নাম 'বৈদেহী' তো এই জন্যই। আসল নামটি কিন্তু তা নয়। কি বলতো?"

শুভা চুপ। জীবকও নীরব।

অভয় হেসে বললেন—"বলতে পারলে না তো? ওঁর পিতৃদত্ত নাম বাসবী। অর্থাৎ ইন্দ্রাণী। তা আমাদের রাজা বিম্বিসারও তো সাক্ষাৎ দেবেন্দ্র।" অভয় নিজের কক্ষে চলে গেলেন।

শুভা জীবককে একটি রক্ষাবন্ধন দিয়ে বললে—"এটা সর্বদা সঙ্গে রাখবেন।"

"দেবী, তথাস্তু।" জীবক হেসে সেটি নিলেন।

* * *

বৈশালী যাত্রা শুরু হলো।

স্বয়ং রাজা বিম্বিসার এসেছেন বুদ্ধকে গঙ্গাদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। উরুবিল্ব থেকে বুদ্ধ যখন ঋষিপত্তনে যান গঙ্গাদ্বারে এসে বিপদে পড়েছিলেন। কড়ি নেই। নিঃস্ব সন্ন্যাসী। মাঝিও পার পার করবে না। অনেক মিনতি করে পার হন।

সব শুনে বিম্বিসার সন্ন্যাসী, শ্রমণদের শুল্ক নেওয়া বন্ধ করে দেন।

বুদ্ধ যখন এলেন তখন একশত নৌকায় পাঁচশত শ্রমণ উঠে পড়েছেন। একজন লিচ্ছবি দলপতিও যাচ্ছেন পথ প্রদর্শক হয়ে।

সারিপুত্র বললেন—"কি আশ্চর্য! বৈশালীতে প্রভু যাওয়ার কথা হতেই দু'তিন দিন নাকি খুব বৃষ্টি হচ্ছে। মড়ক কমে গেছে।"

জীবক হাতটা কপালে ঠেকালেন।

মড়ক কমে গেছে। তবু শ্রমণেরা একটি আরোগ্যশালা খুলে দিলেন। রাজপথ ঝাঁট দিলেন—চূণ ছড়ালেন। প্রণালীগুলি জলের তোড়ে নিষ্কাশিত করলেন। সব আবর্জনা আগুনে পোড়ালেন।

জীবক পানীয় জল সিদ্ধ করালেন দূষণ মুক্তির জন্য। নিয়ম হলো—কোন শ্রমণ বা নাগরিক সিদ্ধ জল ভিন্ন আর কোন পানীয় খাবেন না। যারা তখনো অসুস্থ ছিল—তাদের আরোগ্যশালায় আনা হলো। ঔষধ দেওয়া হলো। লেবু ও লবণ মিশ্রিত রস পান করানো হলো।

লিচ্ছবিরা বুদ্ধকে থাকবার জন্য দিয়েছিলেন মহাবনে কূটাগার শালা। চারিদিকে শালবনের মধ্যে ভবনটি অবস্থিত। কিন্তু বুদ্ধ প্রতিদিন নগরের মধ্যে আসতেন—শ্রমণদের কাজ দেখতেন—রোগ নিরাময়ের পরামর্শ দিতেন। যেখানেই আর্ত সেখানেই সেবা করতেন। বৃজির জনসাধারণ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলো। মড়ক আর নেই বললেই চলে। সবই সম্ভব হয়েছে সুগতের কৃপায়। আর দু এক দিনের মধ্যেই রাজগৃহ ফেরা হবে।

ভৃগুবার। মধ্যরাত্রি। সারিপুত্র এসে জীবককে জানালেন—"রাজা শুদ্ধোদন গুরুতর পীড়িত। প্রভু যাচ্ছেন তাঁকে শেষ দেখা দেখতে। আপনিও চলুন।"

"আরোগ্যশালার কি হবে?"

"কাশ্যপ এর ভার নেবেন।"

"চলুন।"

*　　*　　*

অন্ধকারে যাত্রা শুরু হলো। দ্রুত যাত্রার জন্য বৃজিরা কয়েকটি রথ দিয়েছিল। কিন্তু কে চালাবে? বুদ্ধ বললেন—"আমি

চালাব।” জীবক সারিপুত্রকে প্রশ্ন করলেন—“আপনি কি রথ চালাতে জানেন?” সারিপুত্র একটু লজ্জিত। তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে—রথ চালাতে জানেন না। শাস্তা জানেন—ভালই রথ চালাতে জানেন। জীবকও জানেন। সবাই এঁদের সারথ্যেই চললো।

কপিলবাস্তু এসে তাঁরা যখন পৌঁছলেন সবে ভোর হচ্ছে। তাঁরা প্রাসাদে এলেন। জীবক রাজার কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন পালঙ্কে শায়িত শুদ্ধোদন—নিঃশেষিত-তৈল প্রদীপের শিখার মতো ম্লান, নির্জীব। জীবক তখনই স্বর্ণভস্ম মধুতে মেড়ে রাজাকে খাইয়ে দিলেন। জীবনী ফিরে আসুক। একটুক্ষণ হলেও ফিরে আসুক। আমি বৈদ্য। আমি প্রাণকে সহজে যেতে দিতে পারি না। যাই হোক জীবকের ওষুধে কাজ হলো। শুদ্ধোদন চোখ মেলে চাইলেন। চেয়েই দেখলেন বুদ্ধকে। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বুদ্ধ পিতাকে অর্হৎবর্গ শোনাতে লাগলেন। বললেন—“আমি এত দিনের সাধনায় যে অর্হত্ব লাভ করেছি, আপনি আমার মুখে শুনে সেই পদ লাভ করবেন।”

ততক্ষণে নন্দ, আনন্দ, রাহুল এবং দেবদত্ত এসে গেছেন। আনন্দের মাথায় একটি সাদা পট্টি। দিন কয়েক আগে তাঁর মাথার স্ফোটক জীবক শল্য চিকিৎসায় ভাল করেছেন।

শুদ্ধোদন দেখলেন তাঁর মৃত্যুকালে সবাই উপস্থিত। মহাপ্রজাবতী পায়ে হাত বোলাচ্ছেন। মাথার কাছে রাহুলমাতা—চন্দনের পাখা বীজন করছেন।

বুদ্ধ বললেন—“পিতা, স্বর্গে দুন্দুভি বাজছে। দেবতারা এসেছেন আপনাকে নিতে। ভীত হবেন না। শোক করবেন না। এ জগত জলবুদ্বুদের মতো। সমুদ্রের ফেনার মত আমরা তাতে ভাসছি। সবই অনিত্য। সবই ভেসে যাচ্ছে মেঘখণ্ডের মতো। নানা রং—নানা আকার। কিন্তু কিছুই স্থায়ী নয়। চিত্রকরের চিত্র যেন। এই আঁকছি, এই মুছে ফেলছি।”

শুদ্ধোদন ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—"সবই অনিচ্চ। (অনিত্য)।" তারপর পাশ ফিরে শুলেন। আর নেই।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ হয়ে গেল। মহাপ্রজাবতী সংজ্ঞা হারিয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। রহুল-মাতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। রাজভ্রাতা শুক্লোদন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন—তাঁর মাথায় এখন কপিলবাস্তুর ভার পড়লো।

জীবকের সূচিকাভরণ হাতেই থেকে গেল। তিনি বললেন—"হৃদয় তো তাঁর আগেই বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর তা যুদ্ধ করতে পারলো না।"

তিনি তাকিয়ে দেখলেন তথাগত ধ্যানমগ্ন। নন্দ, রাহুল সশব্দে কাঁদছেন। একে একে আত্মীয় পরিজনেরা শেষ দর্শনের জন্য আসতে লাগলো। সারিপুত্র নতমস্তকে কক্ষ ত্যাগ করলেন—সঙ্গে সঙ্গে জীবকও।

* * *

শুদ্ধোদনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। এই দশ দিনই শাস্তা সমস্তক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এবার তাঁকে ফিরতে হবে। সহসা মহাপ্রজাবতী একদল শাক্য মহিলা সহ ন্যগ্রোধারামে বুদ্ধের কাছে এসে উপস্থিত। তাঁর প্রার্থনা—তাঁকে অনাগামিত্ব দান করতে হবে। বুদ্ধ বললেন—"স্ত্রী জাতি মারের ছলনা। তারা ভিক্ষুনী হবে? অসম্ভব।" আবার বললেন—"তোমরা সংসারের ভিত্তি। তোমরা গৃহ ছাড়লে গৃহীর কি হবে?"

শাস্তা সশিষ্য তখুনি কপিলবাস্তু ত্যাগ করলেন। চলে এলেন মল্লভূমের নাটিকা গ্রামে। কিন্তু মহাপ্রজাবতী ছেড়ে দেবার লোক নন। পদব্রজে বুদ্ধের পিছনে পিছনে এসে ছিন্ন কেশে ছিন্ন বেশে রাজপথে বসে রোদন করতে লাগলেন। অভিজাত শাক্য মহিলাদের তো পথে হাঁটা অভ্যেস নেই। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে আনন্দ ব্যথিত হলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শুদ্ধোদনের অগ্রমহিষী, দেবদহের

রাজকন্যা, বুদ্ধের পালিকা-মাতা, নন্দের জননী, কি তাঁর প্রতাপ ছিল। কি ঐশ্বর্য! আজ ধুলোয় বসে কাঁদছেন!

আনন্দ বুদ্ধকে সব কথা জানালেন। অনুরোধ করলেন—"ভদন্ত, এদের দীক্ষা দিন।"

বুদ্ধ বললেন—"না, আনন্দ, তা হয় না। আমি কোন রমণীকে দীক্ষা দেব না।"

"ভদন্ত, মহাপ্রজাবতী তো সামান্য রমণী নন। তিনি আপনার ধাত্রী। নিজ সন্তানের চেয়েও বেশী আপনাকে ভালবাসেন। তিনি আপনাকে স্তনদুগ্ধ দিয়েছেন। আপনি তাঁকে ধর্মদুগ্ধ দিন।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বুদ্ধ বললেন—"দীক্ষা দিতে পারি। যদি ওঁরা আটটি শর্ত মানেন।"

"কি সেই শর্ত?"

বুদ্ধ বললেন—"আটটি প্রধান ধর্ম মেনে চলতে হবে।

১। যদি ভিক্ষুরা সদ্য দীক্ষিতও হয় তাহলে প্রাচীন ভিক্ষুনীদের দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে।

২। যেখানে কোন ভিক্ষু নেই এমন স্থানে ভিক্ষুনীরা বর্ষাবাস করতে পারবে না।

৩। প্রতিপক্ষে ভিক্ষুনীদের ভিক্ষু সঙ্ঘে এসে ধর্ম—উপদেশ গ্রহণ করতে হবে।—

৪। বর্ষাবাসের পর ভিক্ষুনীদের ভিক্ষুনীসঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘ উভয়ের কাছে বর্ষাবাস কালের সব বৃত্তান্ত স্বীকার করতে হবে।

৫। কোন ভিক্ষুনী গুরুদোষে অপরাধী হলে উভয় সঙ্ঘের কাছে শাস্তি পাবে।

৬। দুবছর শিক্ষাধীন থাকার পর ভিক্ষুনীদের উভয় সঙ্ঘের কাছে উপসম্পদার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে।

৭। ভিক্ষুনীরা কোন কারণে ভিক্ষুদের প্রতি আক্রোশ বা কটু ভাষা প্রয়োগ করতে পারবে না।

৮। এখন থেকে ভিক্ষুনীরা ভিক্ষুদের শাসন বচন বলতে পারবে না। কিন্তু ভিক্ষুরা পারবে।

আনন্দ, যদি মহাপ্রজাবতী এ নিয়মগুলি পালন করতে পারেন তবে তাঁকে দীক্ষা দেওয়া যেতে পারে।"

মহাপ্রজাবতী সব শুনে বললেন—"আমরা মানব।" তখন বুদ্ধ তাঁদের দীক্ষা দিলেন। প্রথম যাঁরা দীক্ষিতা হলেন তাঁদের নাম মহাপ্রজাবতী, তিষ্যা, অভিরূপা নন্দা, মহাপ্রজাবতীর কন্যা সুন্দরী নন্দা, মহাপ্রজাবতীর ধাত্রী বডঢেসী। এই উপলক্ষে তিষ্যা লিখেছিলেন—

'শিখগো ত্রিবিধ ধর্ম, ওগো তিসসে, এই শুভযোগে
কাটিয়া আসব যোগ মুক্তি লভি বিচর এ লোকে।'

বুদ্ধ কিন্তু বিষণ্ণ।

আনন্দকে বললেন—"আমার ধর্মের আয়ু পাঁচশ বছর কমে গেল।"

জীবকেরও মনে হলো—আনন্দ খুব ভুল করল।

সারিপুত্র হাসলেন—"মেয়েরাই তো মায়া। তারা মায়াতীত হবে কি করে?"

জীবক বললেন—"ধর্মসেনাপতি, আপনি ভীত হচ্ছেন না? কামিনীরা সঙ্ঘে এলে সমস্যা দেখা দেবে না?"

সারিপুত্র বললেন—"কামিনীরা যদি কামিনীই থেকে যান তবে মুশকিল। কিন্তু তাঁরা যদি হয়ে উঠেন প্রজ্ঞাবতী তাহলে ভয়ের কিছু নেই। ঋষি ধর্মে বহু নারীই তো ঋষি হয়েছেন—গার্গী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা। এজন্যই তো প্রভু বললেন—সত্যকার ভিক্ষুনী হয়ে উঠতে হবে। কিসের ভিক্ষা? অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার? না। ত্যাগ, তিতিক্ষা, ত্রিশরণের জন্য ভিক্ষা।"

বুদ্ধ বৈশালী চলে গেলেন। এখানেই যাপন করবেন পঞ্চম বর্ষা। আর জীবক ফিরে এলেন রাজগৃহে।

*　　　*　　　*

রাজগৃহে ফিরে জীবক শুনলেন বিম্বিসার গুরুতর অসুস্থ। অভয় বললেন—"রক্তস্রোতে যেন ভেসে যাচ্ছেন রাজা। যন্ত্রণায় অতি কাতর। জীবক, তুমি এখনি যাও। প্রতিকার কর।"

জীবক প্রাসাদে এলেন। খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—"ভয়ের কিছু নেই।"

বিম্বিসার ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—"আমার কি হয়েছে?"

"অতি মাংসভোজনের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য। তার ফলে ভগন্দর। শল্য চিকিৎসা একটু করতে হবে।"

"শল্য চিকিৎসা?" রাজা আর্তনাদ করে উঠলেন।

"আপনি এত যুদ্ধ করেছেন। অঙ্গ জয় করেছেন। একটু শল্যাঘাতেই আপনায় ভয়? কিছু ভয় পাবেন না। জানতেই পারবেন না কখন আঘাতটি হলো।"

"জীবক, আমি আর বাঁচব না।" বিম্বিসারের কণ্ঠ করুণ।

জীবক হাসলেন—"বাঁচবেন বৈকি। অনেক বেশিদিন বাঁচবেন। যতদিন বাঁচতেন তার চেয়েও বেশী বাঁচবেন। কিন্তু কে আমাকে সাহায্য করবে?"

রাণীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

শুভা এগিয়ে এলো। বললো—"আমি থাকব।"

"তুমি? বেশ। কাল প্রত্যূষে আমি আসব। রাজাকে এই রেচক আজ খাওয়াবে। ঘরটি পরিষ্কার করে রাখবে। কেউ যেন কক্ষে না থাকে। বাকি সব আমি আনব।"

পরদিন জীবক এলেন। রাজাকে মাধ্বী পান করালেন। তার মধ্যে মিশ্রিত ছিল অহিফেন রস। অল্পক্ষণে রাজার গভীর ঘুম এলো। অতি দ্রুত ভেদকর্ম শেষ করলেন জীবক। শেষ করে—

ক্ষতস্থানে ছড়িয়ে দিলেন হরিদ্রাচূর্ণ, রক্তচন্দন। তারপর ধৌত কার্পাসবস্ত্র দিয়ে বন্ধন করে দিলেন। সমস্তক্ষণ রাজা নিদ্রিতই রইলেন। শুভা জীবককে সময় মত উষ্ণ জল—অস্ত্র সবই ধীর ভাবে এগিয়ে দিচ্ছিল। অস্ত্রোপচারের শেষে জীবক বললেন—"তুমি খুব ভাল চিকিৎসক হতে পারতে।"

শুভার মুখ উজ্জ্বল।

জীবক বললেন—"রাজা যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন থাকুন। উঠলে তাঁকে উষ্ণ দুধ দেবে। এই নিদ্রার বটিকা রইলো। এটি তারপর খাইয়ে দেবে।"

পক্ষকাল পরে বিম্বিসার সুস্থ হলেন। জীবককে ডেকে গৃধ্রকূটের তলার আম্রকাননটি উপহার দিলেন। জীবকের আনন্দ ধরে না। আম্রকাননের দুটি আম এনে তিনি রাজকুমারী শুভাকে দিয়ে বললেন—"এখন থেকে তুমি হলে নব আম্রপালি।"

শুভা হেসে বললে—"আমি কেন তা হব? আপনিই হলেন আম্র-পাল। পিতা আপনাকেই তো কাননটি দিয়েছেন। এখন আপনাকে বোধহয় উজ্জয়িনী যেতে হবে।"

"কেন?"

"উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের খুব অসুখ। সেখান থেকে লোক এসেছে আপনাকে নিয়ে যেতে।"

"কি অর্থ দেবে?"

"ঐ আপনার বড় দোষ। কেবল অর্থ, অর্থ করেন। কাজটা কি বড় কথা নয়?"

"বুদ্ধশিষ্যের মত কথাটা ঠিকই বলেছ। অর্থ বড় কথা নয়। পরমার্থই সব। কিন্তু মর্ত্যে অর্থের দরকার আছে।"

শুভার মুখটা লাল হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—"রাজা প্রদ্যোত বলেছেন—তিনি দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। কিন্তু······"

"কিন্তু কি ?"

"আনতে পারবেন কি ?"

"কেন ? তাঁকে নিরাময় করে দিলে কেন আনতে পারবো না ?"

"সাবধান ! উনি প্রচণ্ড ক্রোধী—অত্যন্ত অবুঝ। তাই ভয়ে লোকে তাঁকে বলে 'চণ্ডপ্রদ্যোত'।"

জীবক গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আর তখনি রাজসভা থেকে ডাক পড়লো ভিষগরত্নকে রাজা চাইছেন। জীবক রাজসভায় এলেন।

রাজা বিম্বিসার সভা করে বসে আছেন। সামনেই অবন্তী রাজ্যের মহামন্ত্রী ভরত। বিম্বিসারের আরোগ্যের কথা দেশে দেশে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। মহারাজ প্রদ্যোতের পাণ্ডুরোগ হতেই অবন্তীর মন্ত্রীরা বললেন—"রাজগৃহের রাজবৈদ্যকে আনা হোক।" চণ্ড-প্রদ্যোতের সঙ্গে কূটনৈতিক মৈত্রী দৃঢ় করার এই সুযোগ। বিম্বিসার জীবককে বললেন—"অবন্তীরাজ খুব পীড়িত। সংবাদ এনেছেন মহামন্ত্রী। তুমি যাও, দেখে এস। এঁরা তোমাকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবেন।"

জীবক বললেন—"যথা আজ্ঞা।"

* * *

জীবক মহামন্ত্রী ভরতের সঙ্গে উজ্জয়িনী যাত্রা করলেন। তিনি চণ্ড প্রদ্যোতের ক্রোধী স্বভাবের কথা শুনেছিলেন। তাই পথে পথে বিশ্রামশালায় দ্রুতগামী অশ্বের জন্য আগাম অর্থ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশ্যই ভরতের অসাক্ষাতে। এ ছাড়াও ভরতের সঙ্গে তিনি শর্ত করেছিলেন অশ্ব নিয়ে তিনি বনে উপবনে ঘুরবেন ওষধির সন্ধানে। তাঁকে বাধা দেওয়া চলবে না। সাতদিন পর তাঁরা উজ্জয়িনী পৌঁছোলেন। প্রদ্যোতের সমস্ত অঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ—চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ। জীবক বুঝলেন দুরন্ত পাণ্ডুরোগ। তিনি বিধান দিলেন—"পলান্ন, শূলপক্ক মেষমাংস, মিষ্টান্ন নিষিদ্ধ।" প্রদ্যোত শুনে খুব রেগে

গেলেন। এরপর জীবক যখন বমন, বিরেচন ইত্যাদির জন্য ঘৃত, পঞ্চতিক্ত দিলেন, প্রদ্যোত বললেন—"আমি অপক্ক ঘৃত খাই না। ভেবেচিন্তে ওষুধ দিও।" অগত্যা জীবক ইক্ষুরসের বিধান দিয়ে নিজ কক্ষে ফিরে এলেন। অনেক চিন্তার পর ত্রিকটু মিশিয়ে ঘৃতের বর্ণ গন্ধ স্বাদ বদলে একটি পাঁচন তৈরি করলেন। খাবার সময় রাজা বুঝবেন না। ঘণ্টাখানেক পরে যখন বমন শুরু হবে তখন ঘৃতের গন্ধ লুকানো যাবে না। তখনি তিনি বৈদ্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন।

জীবক স্থির করলেন কয়েকটি প্রাণদায়িনী বটিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রীর হাতে দেবেন—আর কাল সকালে পাঁচনটি খাইয়েই পলায়ন করবেন। দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আশা ত্যাগ করাই বিধেয়। রাজকুমারী শুভা ঠিকই বলেছিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে জীবক প্রথমে মন্ত্রী ভরতকে বটিকাগুলি বুঝিয়ে দিলেন। অমৃতভুম্বীর রসে প্রস্তুত বটিকাগুলি এ রোগে অমোঘ। তারপর রাজার কাছে গিয়ে ফলের রসের সঙ্গে পাঁচন খাওয়ালেন। তারপরেই প্রাসাদ ছেড়ে রাজগৃহের পথে ঘোড়া ছোটালেন। বলে গেলেন—"ওষধির সন্ধানে যাচ্ছি।"

ঘণ্টাখানেক পরে রাজার বমন হলো। বমনে ঘৃতের গন্ধ। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—"বৈদ্যকে ধরে আন। বধ কর। এমন সাহস, রাজাদেশ লঙ্ঘন করে?"

রক্ষীদল ছুটল। কক্ষে জীবক নেই। নিকটস্থ বন উপবন খুঁজল। জীবক নেই। দ্বারের প্রহরী বললো—"তাঁকে তো অশ্বপৃষ্ঠে রাজগৃহের দিকে যেতে দেখলাম।" চণ্ড প্রদ্যোত শুনে অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হলো—"বৈদ্য আমাকে বোকা বানিয়ে পালালো?" মন্ত্রী ভরত ততক্ষণে এসে গেছেন। রাজাকে শান্ত করে বললেন—"তিনি আপনার ওষধি খুঁজতে বনে বনে ঘুরছেন।" রাণীর হাতে অমৃতভুম্বির বটিকাগুলি দিয়ে বললেন—

"আমি রক্ষীদল নিয়ে যাচ্ছি। বৈদ্যকে ধরে আনব, যে করে পারি।"

ভরত রক্ষীদল নিয়ে রাজগৃহের পথ যতক্ষণে ধরলেন—ততক্ষণে জীবক অনেক দূর চলে গেছেন। ঘোড়ার পর ঘোড়া বদলে তিনদিনে পেঁৗছে গেলেন রাজগৃহের সীমান্তে।

অভয় সব শুনে বললেন—"ঠিক করেছ। রাজাদের বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে অরিষ্টনেমির পুত্র চণ্ড প্রদ্যোত যে কোন অন্যায় করতে পারে।"

বিম্বিসারও অভয়ের কথার প্রতিধ্বনি করলেন। অজাতশত্রু সব শুনে সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। অন্যদিকে অভয় উজ্জয়িনীর নটিমুখ্যা পদ্মাবতীর কাছে দূত পাঠালেন—তিনি যেন রাজাকে প্রশমিত করেন।

এদিকে কয়েকবার বমনের পর প্রদ্যোত প্রফুল্ল বোধ করছেন। বিফল ভরত ফিরতেই বললেন—"তুমি এখনি রাজগৃহে যাও। জীবককে নিয়ে এস। আমি তাকে দশ সহস্র কি, বিশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবো। মহারাণী তাঁকে এই বহুমূল্য বস্ত্রটি পাঠাচ্ছেন। তিনি যেন নিশ্চয় আসেন।"

অতএব উজ্জয়িনী থেকে ফিরবার কয়েকদিন পরেই জীবকের রাজার কাছে ডাক পড়লো। এবারেও এসে দেখেন, রাজা বিম্বিসার এবং তার সম্মুখে মহামন্ত্রী ভরত। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা চাইলেন। জীবক বললেন—"আমি উজ্জয়িনী যাব না। রাজা যদি সুস্থ হয়ে থাকেন তবে সে কথা স্মরণ রাখুন। বিশসহস্র কেন, শতসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেও আমি যাব না।"

ভরত কি করেন? বিনীত কণ্ঠে বললেন—"এই মহার্ঘ বস্ত্র মহারানী আপনাকে উপহার দিয়েছেন। আপনি কি নেবেন?"

অগত্যা জীবক তা গ্রহণ করলেন। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে

তৎক্ষণাৎ তিনি বেণুবন বিহারে গেলেন। বুদ্ধের পায়ে বস্ত্রটি রেখে বললেন—"ভগবন, এটি আপনি গ্রহণ করুন।"

স্মিত হেসে উপহার নিয়ে বুদ্ধ বললেন—"বিগত দশ বছরে আমাকে কেউ বস্ত্রদান করেনি। বৎস, তুমিই আমাকে প্রথম বস্ত্র দিলে।"

জীবকের চোখ জলে ভরে উঠলো।

* * *

জীবক শুভাকে আয়ুর্বেদ বোঝাচ্ছিলেন। "ঋতুহরিতকী বলে একটা কথা আছে, জানো। অম্বুবাচী থেকে আরম্ভ করে প্রতি দুমাসে সৈন্ধব লবন, শর্করা, শুঠ, পিপুল, মধু, ঈক্ষুগুড় দিয়ে হরিতকী চূর্ণ খেতে হয়। মহারাজকে এই ঋতু হরিতকী রোজ খাওয়াবে।"

এমন সময় আনন্দ এসে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে মোগ্‌গলায়নও। "প্রভুর উদরশূল হচ্ছে। উষ্ণ জল খাইয়েছি। কিছু হয় নি।" জীবকের সামনেই ছিল কিছু মুচকুন্দ চাঁপা। মোগ্‌গলায়নের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—"এগুলি শুঁকতে বলুন, ব্যথা কমে যাবে।"

মোগ্‌গলায়ন অবাক—"ফুল শুঁকলেই ভালো হয়ে যাবেন?"

"হ্যাঁ, হতে পারেন। তবে আমি ওষুধও দিচ্ছি। আপনি চলে যান। যন্ত্রণার উপশম করুন। আনন্দের হাতে আমি রোগ উপশমের ঔষধ দিয়ে দেব।"

মোগ্‌গলায়ন দ্রুতগতিতে চলে গেলেন।

জীবক জোয়ান, বীটলবণ প্রভৃতি মেড়ে বটিকা তৈরী করে নীলপদ্মের পাপড়িতে মুড়ে তিনটি বটিকা আনন্দের হাতে দিলেন। আনন্দ সন্দেহের সুরে বললেন—"নীলপদ্মের পাপড়িও প্রভু খাবেন?"

জীবক বললেন—"আনন্দ, প্রভুর মন সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল। তাঁকে এমনি ওষুধ দিলে কাজ হবে না। সুন্দর করে দিতে হবে।

রোগীকে সারাতে গেলে তার মনটিও বুঝতে হয়। উনি যখন শিক্ষা দেন—লোক বুঝে শিক্ষা দেন না? মনে নেই, সুমন স্বর্ণকারকে তোমরা নশ্বরত্ব বোঝাবার জন্য শ্মশানে নিয়ে যেতে। সে কিছুই বুঝত না—শুধু বিষণ্ণ হয়ে ফিরত। তখন প্রভু কি করলেন? তাকে ডেকে তার জীবিকার কথা শুনে নিলেন। বুঝলেন, সে সুন্দরের পূজারী। শ্মশানে গেলে তার ঘৃণার উদ্রেক হয়। এতে সে নশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। তখন তিনি তাকে দিলেন একটি নীল পদ্ম। প্রতিদিন তার সামনে ধ্যান করতে বললেন আর পদ্মটির পরিবর্তন লক্ষ্য করতে বললেন। কয়েকদিন পরে পদ্মটি শুকিয়ে গেল, ঝরে গেল, ধুলো হয়ে গেল। সুমন বুঝল নশ্বরত্ব কি।"

আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে বলল—"ঠিক বলেছেন, ভিষগরত্ন। আমাদের সোনও তো এমনি। ভীষণ কঠিন তপস্যা শুরু করল। খায় না, ঘুমোয় না। শরীর ক্রমে দুর্বল। শেষে মূর্ছিত হয়ে পড়লো। ভদন্ত শুনে বললেন—'সোন, তুমি যখন অঙ্গরাজ্যে ছিলে, বীণা বাজাতে?'

সোন বলল—'ভদন্ত, বাজাতুম।'

'বীণার তার যদি খুব জোরে বাঁধা হয় তাহলে কি বাজানো যায়?'

'না।'

'বীণার তার যদি ঢিলে করে বাঁধি, তাহলে বাজবে?'

'না।'

'তাহলে তার কি করে বাঁধব?'

'না কষা—না ঢিলা। মাঝামাঝি করে বাঁধতে হবে। তবে সুর বাজবে—রাগ-রাগিনী রূপ নেবে।'

'তবে? তপস্যাও তেমনি। বেশী কঠোর হলে দেহ দুর্বল হয়ে যাবে। কম করলে মন চঞ্চল হয়ে যাবে। বোধি তো একদিনে

পাওয়া যায় না। অনেক জন্মের সাধনা। সাধনায় তাই মধ্য পন্থাই শ্রেয়। খাবে দাবে—বেড়াবে—ধ্যান করবে।"

জীবক বললেন—"পথটি কি সুন্দর সোনকে বোঝালেন।"

আনন্দ বলল—"এবার যাই। অনাথপিণ্ডদ এসে বসে আছেন নতুন বিহারের বিরাট এক মানচিত্র নিয়ে।"

"তাই নাকি? প্রভু কি ষষ্ঠ বর্ষা শ্রাবস্তীতে থাকবেন?"

"তাই মনে হচ্ছে।"

জীবক বললেন—"শাস্তা কেমন আছেন দেখতে কাল যাব।"

* * *

জীবক সকালে বুদ্ধ কেমন আছেন দেখতে গেলেন। বুদ্ধ তখন শিগালের সঙ্গে কথা বলছেন। শিগাল রোজ সকালে দিক-প্রণাম করত। এ দৃশ্য জীবকও দেখেছেন। বুদ্ধ বলছিলেন—"শিগাল, এরকম কর কেন? আর্যরা তো করে না।"

শিগাল বললো—"আপনিই বলুন আর্যরা কি করে?"

বুদ্ধ তখন দিক প্রণামের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। "চারটি পাপ করবে না—প্রাণীহিংসা, চৌর্য, মিথ্যাভাষণ, পরদারগমন। চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যায় করবে না—পক্ষপাতিত্ব, বিদ্বেষ, নির্বুদ্ধিতা, ভয়। ছয়টি উপায়ে অর্থনাশ করবে না—সুরাপান, অসময়ে রাস্তায় বিচরণ, মেলায় বেড়ানো, দ্যূতক্রীড়া, কুসঙ্গ, আলস্য। যে এগুলি করে না সে ছয়টি দিককেই প্রণাম করে।" সেদিন অনেক গৃহী ভক্ত এসেছিলেন। বুদ্ধ তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

"অলসরা কেমন হয় জানো? সে বলে বড় শীত, কাজ করতে পারছি না। বড় গরম, কাজ কি করা যায়? এত ভোরে উঠে কেমন করে কাজ করব? এত রাত অবধি কাজ করা কি সম্ভব?"

আবার বললেন—

"যদি তোমার অনেক টাকা হয় তাহলে কি করবে? এক ভাগ ভোগ করো। এক ভাগ ব্যবসায়ে লাগাও। এক ভাগ দান কর। এক ভাগ সঞ্চয় কর।"

আবার দিক সম্বন্ধে বললেন—

"পিতা-মাতা—পূর্বদিক। স্ত্রী-পুত্র—পশ্চিম। গুরু—দক্ষিণ দিক। বন্ধুবান্ধব—উত্তর দিক। ঊর্ধ্ব—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। অধঃ—দাস-দাসী।"



জেতবন বিহার।

শ্রাবস্তী-তে নতুন বিহার হয়েছে। বিরাট বিহার। বিহার নির্মাণ করেছেন অনাথপিণ্ডদ। ভদন্ত বলেছিলেন—"আমি নগরীর মধ্যে থাকব না। আবার নগরীর চেয়ে বেশী দূরেও থাকব না।" অনাথপিণ্ডদ বলেছিলেন—"তাই হবে।"

শুরু হলো স্থান নির্বাচন। তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল কুমার জেতের একটি মনোরম উপবন আছে। অনাথ-পিণ্ডদ কুমার জেতকে বললেন—

"আমি এই উপবন কিনব।"

কুমার জেত বীণা বাজাতে বাজাতে বললেন—"স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ঢেকে দিতে পার এই উপবন? তাহলে বিক্রী করব।"

অনাথপিণ্ডদ বললেন—"তাই দেব।"

পরিচরেরা শকটে করে স্বর্ণমুদ্রা এনে বিছিয়ে দিতে লাগল। জেত তো অবাক। যখন আর একটু ভূখণ্ড বাকি আছে জেত হঠাৎ বললেন—"না, আমি বেচব না।"

অনাথপিণ্ডদ বললেন—"তা হয় না। শর্ত রাখতেই হবে। না হলে আমি ধর্মাধিকরণে যাব।"

জেত বললেন—"যাও।"

শ্রেষ্ঠী ধর্মাধিকরণে অভিযোগ আনলেন কুমার জেতের বিরুদ্ধে।

বিচারক মণ্ডলী সব শুনে বললেন—"রাজকুমার, বিক্রী আপনাকে করতেই হবে।"

কুমার জেত তখন শ্রেষ্ঠীকে বললেন—"কে এই মহাপুরুষ যার জন্য তোমার মত শ্রেষ্ঠী এত খরচ করছে ?"

অনাথপিণ্ডদ বললেন—"তিনি বুদ্ধ।"

"মানুষ বুদ্ধ হয় ?"

"হয়! তা দেখানোর জন্যই তো তাঁকে শ্রাবস্তীতে আনছি।"

জেত তখন হাত জোড় করে শ্রেষ্ঠীকে বললেন—"যেটুকু ভূমি বাকি আছে সেটুকু নিয়ো না। আমাকে রাখতে দাও। আমি বুদ্ধের জন্য চৈত্য নির্মাণ করব। তুমি পুণ্য করছ—আমি করব না ?"

অনাথপিণ্ডদ সম্মত হলেন।

এ গৃহের অলঙ্করণের সমস্ত পরিকল্পনাই ছিল বুদ্ধের। বলেছিলেন, বিহারের বহির্দ্বারে গদা হাতে যক্ষ আঁকা হবে। ভিতরের বৃহৎ কক্ষটির দেওয়ালে জন্ম থেকে পুনর্জন্ম পর্যন্ত মানুষের সব পর্যায় চক্রাকারে আঁকা হবে। তার সাতটি ভাগ। জন্ম, কৈশোর, যৌবন, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, পুনর্জন্ম। বিহারের প্রাঙ্গণে আঁকা থাকবে জাতকের গল্প।

ভৃত্যদের ঘরে থাকবে ভিক্ষু ও স্থবিরদের চিত্র। রন্ধন-শালায় আঁকা থাকবে খাদ্য হাতে যক্ষ। কুয়োর ধারে অলঙ্কৃত হবে পাত্র হস্তে নাগ। স্নানাগারে নরকের চিত্র আঁকা থাকবে।

বুদ্ধের নিজস্ব কক্ষ চন্দনকাঠে তৈরি হবে। নাম হবে গন্ধকুটি বিহার। এখানে আঁকা থাকবে মাল্য হাতে যক্ষ। আরোগ্যশালায় আঁকা থাকবে শুশ্রূষারত তথাগতের চিত্র। চিত্র ও চিন্তার অপূর্ব সমন্বয়।

এই অপূর্ব বিহারে বুদ্ধ এসেছেন ষষ্ঠ বর্ষা যাপনের জন্য। মহারাজ প্রসেনজিৎ ধর্মসভার আয়োজন করেছেন। আজ সেই

সভা বসবে। দিনটি হোল জ্যেষ্ঠী পূর্ণিমা। প্রসেনজিৎ এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন রাণী মল্লিকা, বিম্বিসারভগিনী রাণী বসুসিকা, রাণী উর্বিরি, রাজভগিনী সুমনা। এসেছেন মন্ত্রী মৃগধর এবং তাঁর পুত্রবধূ বিশাখা। রাজকুমার জেত, রাজকুমার বিরুধক। অনাথপিণ্ডদের পরিবারের লোকেরা।

কোশলের ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব করছেন পূরণ-কাশ্যপ। বুদ্ধের সঙ্গে আজ তাঁর দ্বৈরথ। অনাথপিণ্ডদ সকলের পরিচর্যা করে বেড়াচ্ছেন। কাউকে মালা পরাচ্ছেন। কারুর ললাটে তিলক আঁকছেন।

যথা সময়ে বুদ্ধ এসে আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন, মহাকাশ্যপ, কাত্যায়ন ও শিষ্যবর্গ।

প্রসেনজিৎ প্রথমেই বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন—"মহাশ্রমণ, মৃত্যুর পর অস্তিত্ব কি থাকে?"

বুদ্ধ বললেন—"থাকে, থাকেও না।"

প্রসেনজিৎ—"বোঝা গেল না।"

বুদ্ধ—"সব জিনিস কি মুখের ভাষায় বোঝানো যায়? গঙ্গা নদীর তীরস্থ সমস্ত বালুকারাশি কি গুণে বলতে পারেন? এই জন্য কি আপনার কোন হিসেবরক্ষক আছে?"

প্রসেনজিৎ বললেন—"না, ভদন্ত।"

বুদ্ধ বললেন—"কেন তা গোণা বা মাপা যায় না? কারণ তা সমুদ্রের মত অগাধ, অনন্ত।"

পূরণ-কাশ্যপ বললেন—"আপনি কি শূন্যবাদী? নির্বাণ কি আশাহীন এক অন্ধকার?"

কোশলরাজ বললেন—"নির্বাণ যদি অন্ধকারই হয়—তবে কেন রূপ-রস-গন্ধময় এই সংসার ত্যাগ করব? কেনই বা তপস্যার পরিশ্রম স্বীকার করব?"

বুদ্ধ বললেন—"উরুবিল্বে যে সাধনায় সিদ্ধ হলাম—প্রজ্ঞা লাভ করলাম—সে কি শুধু তমসার সাধনা?"

বুদ্ধ পূরণ-কাশ্যপের দিকে তাকিয়ে বললেন—"নির্বাণ শূন্যতা নয়। নির্বাণং পরমং সুখম্। তা গভীর গম্ভীর বর্ণনাতীত। বৃহৎ বিপুল অতল অসীম এক সত্তার অনুভব।"

পূরণ-কাশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন অবস্থা বর্ণনা করুন।"

বুদ্ধ বললেন—"এমন অবস্থা যেখানে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম নেই। আপনাদের উপনিষদেই তো আছে ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্। সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, স্থিতি নেই, গতি নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই।"

ব্যঙ্গভারে পূরণ-কাশ্যপ বললেন—"এ দেখছি মহা অবস্থা।"

শান্তভাবে বুদ্ধ বললেন—"ঠিক বলেছো। মহা অবস্থা।"

প্রসেনজিৎ বললেন—"নির্বাণ প্রাপ্তির কি কোন সহজ পথ নেই?"

বুদ্ধ হেসে উত্তর দিলেন—"না, রাজন্। দ্রুততম যানেও নির্বাণে পেঁছনো যায় না। বিপুল সুখের জন্য অল্প সুখ ত্যাগ করতেই হয়। রাজ্যসুখের জন্য কত যুদ্ধ করেন আপনি। বিদ্যা-সুখের জন্য পূরণ-কাশ্যপ কত নিদ্রাহীন রজনী কাটান। নির্বাণ পরম সুখ। তা পেতে গেলে তপস্যার দুঃখটুকু তো সহ্য করতেই হবে।"

প্রসেনজিৎ বললেন—"নির্বাণের আনন্দ কেমন?"

বুদ্ধ বললেন—"তা বোঝানো যায় না। কারণ নির্বাণের তুল্য যে আর কিছুই নেই।"

পূরণ-কাশ্যপ—"নির্বাণের অস্তিত্ব যখন আছে তখন তার আনন্দ কেন বোঝানো যাবে না?"

বুদ্ধ—"সমুদ্র আছে। তার জল কি মাপা যায়? সবটা বোঝানো না গেলেও কিছু গুণের কথা বলি।

পদ্ম, জল, ওষধি, সমুদ্র, খাদ্য, আকাশ, চিন্তামণি, রক্তচন্দন, ঘৃত, গিরিশৃঙ্গ এই দশটি বস্তুর কথা চিন্তা করুন।

পদ্ম যেমন জলে থেকেও জলে লিপ্ত হয় না, নির্বাণও তেমনি। নির্বাণমুখীরা সংসারে লিপ্ত হন না। জল যেমন তৃষ্ণানিবারক—দহনপ্রশমক, নির্বাণও তেমনি। তৃষ্ণার অন্ত—ত্রিতাপ জ্বালার সমাপ্তি।

ঔষধি যেমন বিষ নাশ করে, রোগ মুক্ত করে, নির্বাণও তেমনি দুঃখ নাশ করে, ভবরোগ দূর করে।

সমুদ্র যেমন বিরাট—বহু নদী এসে তাতে মিলিত হচ্ছে, নির্বাণও তেমনি বহু সাধকের বহু সাধনার ধারার মিলনক্ষেত্র। আবার সমুদ্রের মত পূর্ণ হয়েও তা উপছে পড়ে না।

আকাশের দশটি গুণ—নির্বাণেরও তাই। অজ, অব্যয়, অনাদি, অজর, অমর, অক্ষয়, অবাধ, অতল, অসীম ও অনন্ত।

চিন্তামণি যেমন উজ্জ্বল, সর্বকামপ্রদ, আনন্দদায়ী—নির্বাণও সেইরূপ।

রক্তচন্দন যেমন দুর্লভ, সুগন্ধ, সর্বজনপ্রশংসিত, নির্বাণও তেমনি।

ঘৃতের মত নির্বাণও সুবর্ণ, সুগন্ধ ও সুস্বাদু।

গিরিশৃঙ্গ যেমন দুরারোহ, অত্যুচ্চ ও অটল—নির্বাণও তেমনি পাপের পক্ষে দুরারোহ।

মহারাজ, একদিকে স্বার্থপর বাসনার ক্ষয় অন্যদিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমের সীমাহীন বিস্তার এই দুইয়ের মিলিত লক্ষ্য কি শূন্যতা হতে পারে?

বহু ব্যয় করে বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করার চেয়ে সিদ্ধপুরুষের শরণ গ্রহণ শ্রেয়ঃ। অরণ্যে গিয়ে অগ্নিসেবা বা নক্ষত্রপূজার চেয়ে পুণ্য পুরুষের শরণ গ্রহণ শ্রেয়ঃ। শতবর্ষ ধরে হোম না করে মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ শ্রেয়ঃ।

হীন ধর্মের না করিও সেবা, প্রমাদে হোয়ো না রত,
বর্জিয়া চল মিথ্যাদৃষ্টি, ছাড়ি সংসার পথ।

উলঙ্গ থাকি জটা ধরি শিরে অনশন করি তায়,
ভূমিতে শয়ন, ভষ্ম চূর্ণ লেপন করে যে গায়,
আত্মপীড়ন করিয়া যে জন উৎকট তপে রয়,
সংশয় ভরা সে জনার মন পবিত্র নাহি হয়।

মহারাজ, সত্যনিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা যার আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি মনন্ করতে পারেন, তিনি মুনি। সমাচারী, সংযমী যিনি, তিনি শ্রমণ। সব যজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দানযজ্ঞ। কেন? না, দানে দাতা আত্মাহুতি দেয়। নিজেকে নিবেদন করে। আবার সব দানের শ্রেষ্ঠ ধর্মদান। যিনি তা নিত্য করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ।"

ধর্মসভা ভঙ্গ হলো।

কোশলরাজের সঙ্গে বহু শত ব্যক্তি বৌদ্ধ হলেন।

*　　*　　*

কিছুদিন পরে এক দুর্ঘটনা ঘটলো। তর্কে পরাজিত পূরণ-কাশ্যপ জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন। শ্রাবস্তীতে দুঃখের ছায়া নেমে এলো। বুদ্ধ বুঝলেন তাঁর জনপ্রিয়তা এবার ক্ষুণ্ণ হবে। তিনি অন্তর্ধান করলেন।

শিষ্যরা বললেন—"বুদ্ধ 'ত্রয়োত্রিংশৎ' স্বর্গে গেছেন।" প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ তখন ভিক্ষুনী-সংঘের প্রতিষ্ঠা নিয়ে মহাপ্রজাবতীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। কপিল যেমন তাঁর মা দেবহূতিকে সাংখ্য শিখিয়েছিলেন—বুদ্ধও তেমনি পালিকা মাতা মহাপ্রজাবতীকে অষ্টমার্গে সম্যক্ জ্ঞান দিয়েছিলেন।

মহাপ্রজাবতী নাটিকা থেকে সোজা এসেছিলেন শ্রাবস্তী। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য নারীদের মত রাহুলমাতাও এসেছিলেন। এতদিন তিনি মহাপ্রজাবতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে শীলব্রত পালন করছিলেন। বুদ্ধ এবার তাঁদের উপসম্পদা দান করলেন। এ নিয়ে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন মহাপ্রজাবতী,—

"হে সুগত, তুমি আমাকে সদ্ধর্ম দান করে নবজন্ম
দিয়েছ। তুমি আমার মাতা, তুমি আমার বীর পিতা।
আমি তোমার রূপতনু বর্ধিত করেছিলাম,
তুমি আমার ধর্মতনু বর্ধিত করেছ।
মুহূর্তের তৃষ্ণা দূর করার জন্য তোমাকে স্তনদুগ্ধ
পান করিয়েছিলাম। চিরন্তন তৃষ্ণা দূর করার জন্য
তুমি আমাকে ধর্মদুগ্ধ পান করিয়েছ।
রাজমাতা, রাজমহিষী এসব পদ বহু নারীই পেয়েছে।
কিন্তু তুমি আমাকে বুদ্ধমাতা এই দুর্লভপদ দিয়েছ।"

তারপর তিনি উচ্চারণ করলেন প্রণাম মন্ত্র—

"বুদ্ধবীর নমোত্যত্থু সব্বসত্তানমুত্তম।
... ...
সব্ব দুক্‌খং পরিঞ্‌ঞাতং হেতু তণ্‌হা বিসোসিতা
অরিয়ট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো নিরোধো ফুসিতো ময়া।।"

"বুদ্ধ বীর নমি তোমা, তুমি সর্ব সর্বসত্তা-শ্রেষ্ঠতম,
... ...
দুঃখের নিদান জানি তৃষ্ণা মোর শুকায়েছে প্রাণে,
অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমি লভিয়াছি তব দত্ত জ্ঞানে।"

রাহুলমাতা অতি সঙ্গোপনে থাকতেন। কিন্তু শ্রাবস্তীর মেয়েদের দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি। প্রতিদিন কোন না কোন মহার্ঘ বস্তু তিনি উপহার পেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি শ্রাবস্তী ত্যাগ করে বৈশালী চলে গেলেন।

এদিকে দলে দলে শ্রাবস্তীর মেয়েরা দীক্ষা নিতে আসছে। এঁদের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত হলেন শ্রাবস্তীর মন্ত্রী মৃগধরের পুত্রবধূ বিশাখা।

* * *

সাকেত নগরে সেদিন খুব উল্লাস। বুদ্ধ আসছেন। পথে পথে

ফুলের মালা, রঙীন নিশান। শ্রেষ্ঠীদের ভবনে ভবনে সাড়া। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীও যাবেন শ্রমণ গৌতমের উপদেশ শুনতে। প্রাঙ্গণে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে বিশাখা খেলছিল। পিতাকে দেখে ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বললো—"বাবা, আমিও যাব।" ধনঞ্জয় মেয়েকে বড় ভালবাসতেন। অতি সুলক্ষণা। যেদিন জন্মেছে সেদিন থেকে তাঁর ব্যবসায়ে ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। মেয়ের আবদার শুনে বললেন—"মা, আমি ধর্মসভায় যাচ্ছি। সেখানে তুমি গিয়ে কি করবে ?"

মেয়ে বলল—"বুদ্ধকে দেখব।"

"তুই বুদ্ধের নাম শুনলি কোথায় ?"

"কেন ? ঐ যে দাসীরা বলছিল—অঞ্জন বনে বুদ্ধ এসেছেন—তারা যাবে তাঁকে দেখতে।"

"দাসীরা বলছিল !" ধনঞ্জয় বিস্মিত।

"হ্যাঁ পুন্না বলছিল, চিত্তা বলছিল।"

"তবে চল।"

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কোলে উঠে পাঁচ বছরের বিশাখা বুদ্ধ সন্দর্শনে চললো। সভায় কত লোক। যেন বিশাল সমুদ্র। তার সম্মুখে পূর্ণিমার চাঁদের মত বসে আছেন সম্যক সম্বুদ্ধ। সোনালী গায়ের রং—পীত বসন, পীত উত্তরীয়। মৃদু গম্ভীর স্বরে তিনি যখন উপদেশ দিলেন—তার একবর্ণও বিশাখা বোঝে নি। শুধু সোনালী আলোর ছটায় তার মন ভরেছিল। সারাক্ষণ বাবার কোলে চুপ করে বসেছিল। শ্রেষ্ঠী তো মেয়ের আচরণে খুশি।

গৃহে ফিরে প্রশ্ন করলেন—"কেমন লাগল ?"

বিশাখা বলল—"খুব ভাল।"

ছয় বছর পরে বুদ্ধ এসেছেন আবার সাকেত নগরে। এবার তিনি এসেছেন ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ভবনে। বিশাখা প্রাণভরে বুদ্ধকে দেখলো।

ধনঞ্জয় বললেন—"আমার এই মেয়েটি আপনার খুব ভক্ত।"

বুদ্ধ তাকালেন—এগারো বছরের মেয়ে। চাঁপা ফুলের মত রং, বড় বড় চোখ, তনুদেহ। বুদ্ধের আয়ত চোখে কি ছিল জানি না, বিশাখা তাঁর পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করল। বুদ্ধ তার হাতে একটি শ্বেত পদ্মের কুঁড়ি দিলেন। বিশাখা সেই ফুলটি সযত্নে সাজিয়ে রাখলো আপন কক্ষে। রোজ ধূপ দিত, দীপ দিত, আর ধ্যান করত।

বুদ্ধের উপদেশের একটি কথাই তার মনে ছিল—তণ্‌হা (তৃষ্ণা) জয় করতে হবে। ঐটুকু মেয়ে গয়না পরে না। ভাল শাড়ি দিলে তুলে রাখে। ও কি শেষে সন্ন্যাসিনী হবে? বিশাখার মা চিন্তিত হলেন। স্বামীকে বললেন—"পাত্র খোঁজ।"

ধনঞ্জয়ের মন উঠলো না। বললেন—"এইটুকু মেয়ে!" চিত্রবতী ঝংকার দিয়ে উঠলেন—"এইটুকু কি? বারো গিয়ে তেরোয় পা দিল। এখন বিয়ে হবে না তো বিয়ে হবে কি বুড়ী হলে?"

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বললেন—"আচ্ছা, দেখছি। চেঁচিয়ো না তো। বুদ্ধ চেঁচামেচি পছন্দ করেন না। যা বলবে মৃদুস্বরে বলবে।"

পাত্র ঠিক হলো। খুব ভাল পাত্র। কোশল রাজের মন্ত্রী মৃগধর—তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। নাম পুণ্যবর্ধন—সে থাকে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পায়। ব্যবসা করে, অগাধ উপার্জন। অথচ ধার্মিক, সুশীল। এমন ছেলে বিরল।

কিন্তু বাদ সাধলো বিশাখা—সে বলল—"বাবা, আমি বিয়ে করব না। আমি ভিক্ষুনী হবো।" ধনঞ্জয় বললেন—"কেন মা? তোমার কিসের দুঃখ যে ভিক্ষুনী হবে? তুমি শ্রেষ্ঠী কন্যা। বিবাহ হবে মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে। সেখানে তুমি সুখে থাকবে।"

"বাবা, আমি সঙ্ঘের সেবা করতে চাই।"

"বিবাহ করলেও তুমি সঙ্ঘ-সেবা করতে পারবে। এঁরা ধনী।

সঙ্ঘে অর্থদান করতে তোমার কোন অসুবিধাই হবে না। শাস্তা বলেন—'গৃহও একটা আশ্রম। গৃহী না থাকলে সন্ন্যাসী, শ্রমণদের কে খাওয়াবে? কে বস্ত্র দেবে'?"

বিশাখার মুখ উজ্জ্বল হয়ে আবার নিবে গেল। "কিন্তু এরা যে নির্গ্রন্থি। বৌদ্ধ তো নয়।"

ধনঞ্জয় বললেন—"বৎসে, তুমি যদি এই নির্গ্রন্থিদের বৌদ্ধ করতে না পার তবে এতদিন কি ধ্যান করলে? শুনেছ তো প্রভুর জাতক কথা? মর্কট জন্মে প্রজ্ঞা-পারমিতা। কাঠ-বিড়ালী জন্মে বীর্য-পারমিতা। সিংহ জন্মে সত্য-পারমিতা। বেশ্মান্তর জন্মে দান-পারমিতা। তিনি এসব লাভ করেছিলেন। তুমি এ জন্মে দান-পারমিতা কেন হও না?"

বিশাখা তখন নতমুখে বলল—"বেশ তাই হোক। সঙ্ঘ-সেবার জন্য আমি বিবাহ করব।"

যথাদিনে বিবাহ হয়ে গেল। ধনঞ্জয় কন্যা-জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক দিলেন। লক্ষ টাকার অলংকার, একটি রথ, একটি ঘোটকী, একটি দুগ্ধবতী গাভী, ধান্য ও কার্পাস ক্ষেত্র।

বিদায়ের পূর্বে বিশাখা পিতাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কান্না কাঁদলো। ধনঞ্জয় চোখের জল মুছে বললেন—"এমন সুখের দিনে চোখের জল ফেলিস না। তোর শ্বশুরকে বলেছি, যদি কোন কারণে তিনি তোকে ত্যাগ করেন তবে দশ জন ভদ্র ব্যক্তির সামনে আগে বিচার করতে হবে। তোর কোন চিন্তা নেই। ধান্যক্ষেত্র দিয়েছি—যাতে তোর অন্নের অভাব না হয়। কার্পাস-ক্ষেত্র দিয়েছি যাতে বস্ত্রের অভাব না হয়। অলংকার যা দিয়েছি তাতে অর্থের অভাব হবে না। ভয় কি? শাস্তা আছেন। তুই যাচ্ছিস শ্রাবস্তীতে—সর্বম্ অস্তি—শ্রাবস্তী। যে নগরে সব আছে—সব পাওয়া যায়।"

যাত্রার পূর্বে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কন্যাকে শেষ উপদেশ দিলেন।

"ভিতরের আগুন বাইরে নিয়ো না।

বাইরের আগুন ভেতরে এনো না।

যে দেয় তাকে দিও। যে দেয় না তাকে দিয়ো না। যে দেয় তাকেও দিও। যে দেয় না তাকেও দিও। সুখে উপবেশন কোরো। সুখে আহার কোরো। সুখে শয়ন কোরো। অগ্নি প্রজ্বলিত রেখো। গৃহদেবতাদের শ্রদ্ধা কোরো।"

পাশের কক্ষ থেকে মন্ত্রী মৃগধর এই হেঁয়ালীসূচক কথাগুলি শুনে খুব বিস্মিত হলেন। কিন্তু তখনকার মতো কিছু বললেন না। সাকেত থেকে শ্রাবস্তী পৌঁছতে তিনদিন লেগে গেলো। পথে যেসব স্থানে দস্যুভয় বা যক্ষভয় আছে সেখানে তাঁরা দিবসেই ভ্রমন করছিলেন। শ্রাবস্তীতে তার প্রয়োজন নেই—পৌঁছতে অনেক রাত্রি হলো, বধূবরণ, পুষ্পশয্যা সব শেষ হতে মধ্যরাত্রি। এমন সময় বিশাখার বাপের বাড়ির দাসী এসে বললো যে ঘোটকীটি ধনঞ্জয় দিয়েছিলেন তার প্রসব বেদনা উঠেছে। আসলে তিন দিনের পথকষ্টে সে আগেই প্রসব করছে। বিশাখা তখনি চললো অশ্বশালায়। দাসীর সাহায্যে তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে সুস্থ করে তুলে গুড় খেতে দিলো। অশ্বিনী গুড় পেয়ে খুব খুশি। পাশে খড়ের বিছানা করে শাবকটিকে শুইয়ে রেখে ফিরে এলো সে। ঠিক সেই সময় মৃগধর উঠেছিলেন। তিনি দেখলেন নববধূ মাঝ রাতে কোথা থেকে যেন এলো। তাঁর মনে খটকা লাগলো।

যাইহোক, বিশাখা ছিল কাজের মেয়ে। অন্ধকার থাকতেই উঠতো। গরু দুইয়ে দুধ জ্বাল দিয়ে সবাইকে পরিবেশন করত। তারপর রন্ধনশালায় শ্বাশুড়ী উত্তরাকে সাহায্য করত। শ্বশুর ভোর সকালে ভাত খেয়ে রাজসভায় যান। তিনি যেন ঠিক সময়ে খান সে দিকে খরদৃষ্টি দিত। কিন্তু স্বামী ছাড়া বাড়ির আর কেউ তাকে পছন্দ করত না। কেন? কারণ সে তার জায়েদের মত পরচর্চায় সময় কাটাতো না। কাজের শেষে দরজা

বন্ধ করে বুদ্ধের দেওয়া ফুলের সামনে ধূপ জ্বালিয়ে ধ্যান করত। ফুলটি কবে শুকিয়ে ঝরে গেছে। বিশাখা সেই ঝরা ফুল একটি সোনার কৌটোয় ভরে রেখেছিল। সেই তার স্তূপ ; তার চৈত্য। পরিজনেরা বললো—"বড় লোকের মেয়ে কিনা তাই দেমাকী। দরজা বন্ধ করে সব মন্ত্রতন্ত্র বলে। বৌদ্ধদের কারবার।"

মৃগধর এসব শুনে খুব চিন্তিত। কিন্তু পুত্রবধূর এমন কোন দোষ নেই যে তাকে তাড়িয়ে দেবেন। শ্বাশুড়ী উত্তরা বরং ছোট বউয়ের কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট। ছেলে পুণ্যবর্ধনের তো কথাই নেই। বৌয়ের প্রেমে ডগমগ। কি করা যায় ?

একদিন মৃগধর ভাত খেতে বসেছেন। বিশাখা তাকে পরিবেশন করছে। এমন সময় শ্রমণ তিষ্য এসে উপস্থিত। বিশাখা দেখলেন বিপদ ! বৌদ্ধ শ্রমণকে দেখলে জৈন শ্বশুর অপমান করতে পারেন। তাই শ্বশুরকে আড়াল করে চোখের ইসারায় তিষ্যকে চলে যেতে বলল। মুখে বলল—"আমার শ্বশুর বাসী ভাত খাচ্ছেন।"

শ্রমণ চলে গেলো।

মৃগধর কিন্তু এই কথায় খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বধূকে বললেন—"বিশাখা, তুমি আমার গৃহত্যাগ করে চলে যাও। তোমার আচরণ অসহ্য।"

বিশাখা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—"তাহলে আপনি দশজন ভদ্রলোককে ডাকুন। আমার বিচার হোক। তারা বললে আমি চলে যাব। আমার বাবা, মা আছেন।"

মৃগধর দশজন বিশিষ্ট নাগরিককে ডাকলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন—"তুমি কেন বললে তোমার শ্বশুর বাসী ভাত খাচ্ছেন ?"

বিশাখা বললো—"বাসী ভাতের অর্থ পূর্বজন্মের সুকৃতি। আমার শ্বশুর যে মন্ত্রী হয়েছেন—এত ধন ঐশ্বর্য পেয়েছেন—সে তাঁর পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। কিন্তু এ জন্মে তিনি তো কোন শ্রমণকে দান ধ্যান করছেন না।"

মধ্যস্থরা খুশি হলেন। তাঁরা বললেন—"এজন্য বধূকে ত্যাগ করা উচিত হবে না।"

কিন্তু মৃগধর থামবার লোক নন। তিনি বললে—"শ্বশুরগৃহে পৌঁছে নববধূ মধ্য রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন?"

বিশাখা বললো—"সাকেত থেকে যে ঘোটকীটি যৌতুকস্বরূপ এসেছিল সে ছিল আসন্নপ্রসবা। তাই পথশ্রমে সময়ের আগেই প্রসব হয়ে যায়। তাকে সাহায্য করার জন্যই অশ্বশালায় গিয়েছিলাম।"

মধ্যস্থরা বললেন—"বধূ যথার্থ কাজই করেছে।"

মৃগধর তখন বললেন—"তুমি যখন সাকেত থেকে যাত্রা কর তখন তোমার বাবা কয়েকটি উপদেশ দেন। আমি পাশের কক্ষে বসে শুনেছি। তার অর্থ বুঝি নি। তুমি বুঝিয়ে দাও।"

বিশাখা বললো—"ঘরের আগুন বাইরে এনো না—অর্থ, বাড়িতে যা হয় তা বাইরে বলবে না। বাইরের আগুন ভেতরে এনো না—এর অর্থ, বাইরের কথা সংসারে আলোচনা করবে না। কেউ যদি তোমার শ্বশুর বা পরিজনবর্গকে নিন্দা করে সে কথা জানাবে না। যে দেয় তাকে দিয়ো আর যে দেয় না তাকে দিয়ো না—এর অর্থ সহজ। যে দেয় তাকেও দিও—যে দেয়না তাকেও দিয়ো-এর অর্থ, যে দেয় তাকে তো প্রতিদান দিতেই হবে, কিন্তু যে দরিদ্র, সে দিতে পারুক না পারুক, তাকে দেবে। শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে বসবে না। তাঁদের আহার না হলে খাবে না। তাঁরা শয়ন না করলে শোবে না। তাঁদের অগ্নিবৎ পূজা করবে। দেবতাবৎ জ্ঞান করবে।"

মৃগধর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বিশাখা কিন্তু আর শ্বশুরের গৃহে থাকতে চাইলো না। মৃগধর তখন অনেক অনুনয় করলেন।

বিশাখা বললো—"যদি অপনি বুদ্ধকে এই গৃহে নিমন্ত্রণের অনুমতি দেন তবেই থাকব।"

মৃগধর সম্মত হলেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি নির্গ্রন্থিদের ছেড়ে বৌদ্ধ হলেন। সঙ্ঘে বিশাখার তাই নাম হলো 'মিগারমাতা'।

বিশাখা সঙ্ঘের জন্য বহু দান করেছিলেন। তিনি সকলকে খাদ্য, বস্ত্র তো দিতেনই—স্নান-বস্ত্রও দিতেন। বুদ্ধ যেমন বেশ্মান্তর জন্মে দান—পারমিতার সাধনা করেছিলেন বিশাখারও ছিল তাই লক্ষ্য।

বিশাখা ছিলেন মনে মুখে এক।

সত্য ভাষণের জন্য বুদ্ধ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। বিশাখা দীক্ষা পেয়ে লিখেছিলেন,—

"অনুতপ্ত নহে কেহ যদি চলে বুদ্ধের শাসনে,
দ্রুত ধৌত করি পদ এসে বোস ধ্যানের আসনে।"

শ্রাবস্তীর বহু মেয়ে এসে মহাপ্রজাবতীর ভিক্ষুনীসঙ্ঘে যোগ দিলেন। মহিষী উর্বিরি, রাজভগিনী সুমনা, রাজপুরোহিতের কন্যা দন্তিকা, ব্রাহ্মণকন্যা সকুলা, ক্ষত্রিয়কন্যা সোনা, শ্রেষ্ঠীকন্যা উৎপলবর্ণা,কিশা গৌতমী, এমন কি অনাথপিণ্ডদের দাসী, পূর্ণা।

শুধু শ্রাবস্তী কেন? বৈশালী থেকে এলেন লিচ্ছবি নায়ক সিংহের ভাগিনেয়ী সিহা (সিংহা), রোহিনী, জেন্তি। রাজগৃহ থেকে রাণী ক্ষেমা, তাঁর সহচরী বিজয়া, সারিপুত্রের ভগিনীরা—চালা, উপচালা, শিশুউপচালা, রাজপুরোহিতের কন্যা সোমা। সাকেত থেকে এলেন অনোপমা। মিথিলা থেকে বাশিষ্ঠী। কুরুরাজ্য থেকে নন্দুত্তরা ও মিত্রকালি।

সারিপুত্র নিয়ে এলেন ভদ্রা কুণ্ডলকেশাকে। ইনি জৈন ছিলেন। সারিপুত্রের সঙ্গে তর্কে হেরে বৌদ্ধ হন। মোগ্‌গলায়ন নিয়ে এলেন বিমলাকে—তিনি ছিলেন জনপদবধূ, মোগ্‌গলায়নকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে তাঁর উপদেশ শুনে বৌদ্ধ হন।

প্রভুর বাণীতে এমন কিছু ছিল যা রাণী থেকে দাসী, এমন কি বারবধূকেও, আকৃষ্ট করত।

মহাপ্রজাবতীর ধাত্রী বড়ঢেসা, অনাথপিণ্ডদের দাসী পূর্ণা এর

উদাহরণ। নগরশোভিনীদের মধ্যে উজ্জয়িনীর পদ্মাবতী, কাশীর অর্ধকাশী, বৈশালীর অম্বপালি ছিলেন প্রভুর ভক্ত।

অর্ধকাশী ছিলেন কাশীর নটিমুখ্যা। এত ধনী ছিলেন যে কাশীর অর্ধেক বাড়ি-ঘর ছিল তাঁর। বুদ্ধের কথা শুনে তিনি যখন প্রভুর কাছে আসতে চাইলেন নাগরিকেরা বাধা দিল। তবু তিনি গোপনে বুদ্ধের উপদেশ চেয়ে পাঠালেন।

বুদ্ধ তাঁকে উপদেশ পাঠান।

পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা, স্বামীপরিত্যক্তা, বিধবা কত দুঃখিনীরা প্রভুর বাণীতে শান্তি পেলেন। তাঁরা গাথা লিখলেন রূপের অসারত্ব, দেহের নশ্বরত্ব, জরা, মৃত্যুশোক, ত্রিবিদ্যার মহাত্ম্য, মারের সঙ্গে আত্মদ্বন্দ্ব নিয়ে।

কোশল রাজভগিনী সুমনার কাহিনী এরূপ। মাতৃসেবায় তাঁর সারা জীবন কেটে গেলো। বিবাহ হলো না। ধর্মাচরণ হলো না।

তিনি প্রভুকে প্রশ্ন করলেন—"আমার কি হবে ?" প্রভু উত্তর দিলেন—"তোমার উত্তরণ হয়ে গিয়েছে। তুমি সারা জীবন মাতৃসেবা করেছ। এর চেয়ে বড় তপস্যা কি আছে ?"

সুমনা সঙ্ঘকে বহু অর্থ দেন। দীক্ষিতাও হন। পরে থেরী হয়ে গাথাও লেখেন।

কোশলরাজের মহিষী উর্বিরি কন্যা-শোকে উন্মত্তা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রভুর বাণীতে সান্ত্বনা পেলেন তিনি। সঙ্ঘে দীক্ষা নিয়ে থেরী হলেন। তিনিও গাথা লিখেছিলেন।

মহাপ্রজাবতীর সঙ্গে এসেছিলেন কপিলবাস্তুর ক্ষেমকের কন্যা অভিরূপা নন্দা। অল্প বয়সে বিধবা। কিন্তু সৌন্দর্যের গর্ব যায় নি। বুদ্ধের বাণীতে বুঝলেন রূপ অসার। দেহ ফেনার মত নশ্বর। বত্রিশটি অশুচি বস্তুতে মানবদেহ গঠিত। নন্দা তাই লিখলেন—

"আতুর অশুচি পূতি, হের নন্দা, এ সুন্দর কায়।
একাগ্র করিয়া চিত্ত ধ্যানমগ্ন হও সাধনায়।"

• সন্তানশোকাতুরা কিশা গোতমী লিখলেন সৎসঙ্গ নিয়ে। কিশা মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছিলেন। তাঁর মতে নারীর জীবন দুঃখের। নারী মাত্রেই মন্দভাগ্য। হয় তাকে বহু সতীনের সঙ্গে থাকতে হয়। নয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মরতে হয়। অথবা সন্তানের অকাল মৃত্যু দেখতে হয়।

মৃত সন্তানকে বাঁচাবার জন্য কিশা বুদ্ধের কাছে যান। বুদ্ধ বলেন—"তুমি যদি এক মুঠো সরষে এমন এক বাড়ি থেকে আনতে পার যে বাড়িতে মৃত্যু হয় নি, তাহলে তোমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দেব।"

কিশা তখন দরজায় দরজায় সরষে ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন মৃত্যুর প্রবেশ সর্বত্র। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের চরণ শরণ করে শান্তি পান।

ভিক্ষুনী উৎপলবর্ণার জীবন আরো দুঃখময়। তিনি ছিলেন শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠীকন্যা। পরমাসুন্দরী। পদ্মের মত শুভ্রবর্ণা। দৈব বিপাকে উৎপলবর্ণার নিজের জামাতার সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। তিনি যখন সেটা জানতে পারলেন মর্মাহত হয়ে ভিক্ষুনী হন। থেরী হয়ে তিনি লিখলেন—

"কামে ধিক্, কি দুর্গন্ধ অশুচি কণ্টক,
মা মেয়ের এক পতি, হা ভাগ্য অন্তক!"

বুদ্ধ উৎপলবর্ণাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর মধ্যে একটি স্বর্গীয় প্রভা ছিল। তাই বুদ্ধ তাঁকে বলতেন "বামহস্ত অগ্রশ্রাবিকা"। রাণী ক্ষেমা ছিলেন তাঁর "দক্ষিণহস্ত অগ্রশ্রাবিকা"।

শ্রাবস্তীতে তিন মাস ধরে মহাপ্রজাবতীর সঙ্গে ভিক্ষুনী-সংঘ সংগঠন করে বুদ্ধ ফিরে এসে আবার জেতবনে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর আবির্ভাবের দিনে উৎপলবর্ণা প্রভুর আসবার সিঁড়িটি অপূর্বভাবে সাজিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন বৈদূর্যমণি দিয়ে গড়া।

*   *   *

বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরলেন।

এখানে একদিন ভরদ্বাজ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এলেন। তিনি চাষ-বাস করতেন। বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন—"তুমি চাষ কর না কেন?"

বুদ্ধ বললেন—"আমি চাষ করি। কিরকম জানো? শ্রদ্ধা আমার বীজ। ধ্যান আমার বৃষ্টি। বিনয় আমার লাঙল। মন—যূপকাষ্ঠ। ধারণা—ফলক। সত্য—ক্ষেত্র। বীর্য—বলদ। নির্বাণ—শস্য।"

ভরদ্বাজ এত মুগ্ধ হলেন যে তক্ষুনি দীক্ষা নিলেন।

বুদ্ধ রাজগৃহে এসেছেন শুনে রাহুল-মাতা বৈশালী থেকে ব্যাকুল ভাবে রাজগৃহে এলেন। এখানে তিনি থাকলেন সঙ্গোপনে, প্রায় অদৃশ্য হয়ে। কিছুদিন পরে মহাপ্রজাবতীও এলেন। বুদ্ধ তখন চলে গেলেন গৃধ্রকূটে। রাজা বিম্বিসার প্রভুর ওঠা-নামার সুবিধার জন্য পাহাড় কেটে সিঁড়ি বানিয়ে দিলেন। রথ ওঠার জন্য আর একটি পথও রচিত হলো। বুদ্ধ খুব আনন্দিত। এখান থেকে তিনি রাজগৃহের সবটাই দেখতে পান। দেখতে পান রাজ-গৃহের বাইরের খেত-খামারও। চাষীরা কত ফসল বানায়—সবুজ, হলুদ, যেন পৃথিবীর বুকে পাতা হয়েছে শতরঞ্জি।

বুদ্ধ ইচ্ছা করলেন নবম বর্ষা তিনি কৌশাম্বীতে কাটাবেন। মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিতের পর কৌশাম্বীরাজ উদয়নকে তিনি দীক্ষিত করবেন। যে ধর্মচক্র তিনি ঋষিপত্তনে প্রবর্তন করেছেন তা স্তব্ধ হয় নি। যে নবধর্মের অভিযান কপিলবাস্তু, বৈশালী, শ্রাবস্তীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে—সে তরঙ্গ এখনি নিথর হতে পারে না। তা এক গভীর বিশাল সর্বজনীন প্রবাহ। মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত করে তোলে পূর্ণতার দিকে।

কিন্তু কৌশাম্বীতে প্রধান বাধা রাণী মাগন্দিয়া। মাগন্দিয়া শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ কন্যা। তিনি গৌতম বুদ্ধকে দেখে মুগ্ধ হয়ে

বিবাহ করতে চান। কিন্তু বুদ্ধ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন মাগন্দিয়ার কাকা তাঁকে কৌশাম্বীরাজ উদয়নের কাছে নিয়ে আসেন। মাগন্দিয়া ছিলেন পরমা সুন্দরী। মুগ্ধ উদয়ন তাঁকে বিবাহ করেন। কিন্তু মাগন্দিয়া রাণী হয়েও বুদ্ধকে ভুলতে পারলেন না। বুদ্ধ কৌশাম্বীতে আসছেন এবং শিংশপাবনে ঘোষিতারাম-বিহারে উঠছেন শুনে তিনি রাজাকে বুদ্ধবিরোধী করে তুললেন। তিনি সবাইকে বলতে লাগলেন—বুদ্ধ অকর্মা, অলস, স্বাদুকামী এক ভিখারীর দল গঠন করেছেন। তাদের দিয়ে কারুর কোন উপকার হয় না।

যখন বুদ্ধ উদয়নের রাজসভায় এলেন রাজা তাঁকে দেখে জ্বলে উঠে তীক্ষ্ণ একটি শর নিক্ষেপ করলেন। বুদ্ধ তাঁকে শান্ত হতে বললেন। "ক্রোধ করো না। ক্রোধ থেকে দুঃখ আসে। যুদ্ধের পথে যেও না। গেলে নরক ভোগ হয়। 'নত্থি রাগ সম অগগি; নত্থি দোষ সম কাম।' রাগের মতন অগ্নি নেই—কামের সমান দোষ নেই। হে রাজন্, মোহের মত জাল নেই—তৃষ্ণার মত নদী নেই—বিদ্বেষের মত পাপ নেই—শান্তির মত সুখ নেই।

হে রাজন্, যদি সুখী হতে চাও তবে ইন্দ্রিয় জয় করো, বাসনা জয় করো, তৃষ্ণা জয় করো। এই তিনটি জয় করলেই তুমি জগজ্জয়ী হবে।"

বৎসরাজ উদয়ন—শতানীকের পুত্র উদয়ন—তখন হাতযোড় করে বুদ্ধকে বললেন—"আপনি আমাকে উপদেশ দিন।"

বুদ্ধ হেসে বললেন—"রাজন্, তুমি আমাকে শত্রু ভেবেছ তো? রাণী মাগন্দিয়া তোমাকে তাই বলেছেন? শত্রুজয়ের চেয়ে বড়ো আত্মজয়।

বিচার হোক তোমার তরবারি,
বিশ্বাস, দয়া এবং নীতি হোক তোমার দুর্গ,

সৎগুণ হোক তোমার বাহিনী,
ধৈর্য হোক ধর্ম,
অধ্যবসায় ভরসা,
ধ্যান হোক ধনুক,
নিরাসক্তি হোক শর।”

উদয়ন বুদ্ধকে অনেক মিষ্ট কথা বলে তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন। বীণা বাজিয়ে শোনালেন। বুদ্ধ বিদায় নিলেন।

তিনি শিংশপাবনে ফিরে এলেন। আনন্দ রাজার ব্যবহারে এত ক্ষুব্ধ যে তখুনি কৌশাম্বী ত্যাগ করতে চাইলেন। বুদ্ধ বললেন—“আনন্দ, ধর্মপ্রচার কি এত সহজ? যুদ্ধাভিযান চালানোর মত ধর্মাভিযান চালানোও কঠিন। নবীন ধর্ম কি লোকে এত সহজে নেবে মনে কর? যুদ্ধ-কৌশলের মত ধর্মাভিযানেরও কৌশল আছে—তা ধৈর্য। যুদ্ধের বীররসের মত ধর্মেরও রস আছে—তা শান্ত। ধর্মেরও বল আছে—তা মনোবল।

আনন্দ, মানুষের মনে দেবলোক ও যমলোকের যুদ্ধ হচ্ছে। যমকে হারানো কি সহজ?”

* * *

রাজসভার অন্তরালে একটি কুটিল মুখের দু-চোখে তখন আগুন ঝরছিল। সে মুখ রাণী মাগন্দিয়ার। এই উজ্জ্বল পুরুষোত্তম তাঁর হলো না কেন? উদয়নের আর এক রাণী সামাবতী কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ শুনে মুগ্ধ। মাগন্দিয়াকে ক্রোধে জ্বলতে দেখে বললেন—“আর্যে, সুগত কি মহান্। সাধ্য কি তাঁকে আপনি ইন্দ্রিয়গত করেন? বরং আপনার উচিত সুগতনির্দেশিত পথ গ্রহণ করা।”

মাগন্দিয়া কুপিতা হয়ে বললেন—“তোমার ইচ্ছা থাকে তুমি বুদ্ধপথে যাও। আমি রাজার রাণী, ভিক্ষুনী হতে যাব কোন্ দুঃখে?”

মাগন্দিয়া রাণী সামাবতীর বিরুদ্ধে উদয়নের কাছে এমন করে লাগালেন যে তিনি ভীত হয়ে চুপ করে রইলেন।

মাগন্দিয়ার মৃত্যুর পর সামাবতী ভিক্ষুনী-সঙ্ঘে যোগ দিয়ে থেরী হয়েছিলেন। কৌশাম্বী থেকে ঐ একটি ভিক্ষুনীই সঙ্ঘে এসেছিল। মাগন্দিয়ার প্রতাপে আর কোন কৌশাম্বীর মেয়ে বৌদ্ধ হতে সাহস করে নি।

সামাবতী থেরী হয়ে লিখেছিলেন তাঁর আত্মদ্বন্দ্বের কথা। কত বার তিনি তিনি বিহার ত্যাগ করে গেছেন হৃদয়কে বশ করতে না পেরে। শেষ পর্যন্ত—

"গেল তৃষ্ণা দুঃখ জ্বালা, গেল জীবনের চঞ্চলতা,
বুদ্ধের শাসনে মোর চিত্তে আজি শান্তির সমতা।"

বুদ্ধের দশম বর্ষা যাপনের সময় কৌশাম্বীর ভিক্ষুদের মধ্যে যে দলাদলি সৃষ্টি হলো তা মাগন্দিয়ার কীর্তি। বুদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে সভা করলেন। অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু বিবাদ মিটল না। বুদ্ধ বিরক্ত হয়ে পারিলেখ্য বনে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল—শাস্তা কোথায়? অনাথপিণ্ডদ, যাঁর সংসারে কোন শান্তি ছিল না, যিনি বুদ্ধের চরণ শরণ করে জীবন কাটাতেন, তিনি সব থেকে ব্যাকুল হলেন। ব্যাকুল হলেন বিশাখাও। শেষ পর্যন্ত অনেক সন্ধান করে আনন্দ গিয়ে উপস্থিত হলেন প্যারিলেখ্য বনে। বুদ্ধকে অনেক অনুনয় করে নিয়ে এলেন শ্রাবস্তীতে। সারিপুত্র সাধারণতঃ রাগেন না। কিন্তু তিনিও কৌশাম্বীর ভিক্ষুদের উপর চটলেন। তাঁদের শ্রাবস্তীতে ডেকে পাঠানো হলো। মোগ্গলায়ন রেগে বললেন—"ওদের সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করা হোক।" আনন্দ বললেন,—"কৌশাম্বীর সঙ্ঘ বন্ধ করা হোক।" বিশাখা বললেন—"আমি ওদের খাদ্য, বস্ত্র কিছুই দেব না। কারণ ওরা শ্রমণ-ই নয়।"

কাশ্যপ বললেন—"ওদের জেতবনে প্রবেশ নিষেধ। ওরা এলে এখানের শ্রমণেরা সঙ্গদোষে বিনষ্ট হবে।"

বুদ্ধ সব শুনে বললেন—"সারিপুত্র, ওদের আলাদা বাসস্থান করে দাও। কিন্তু ওদের খাদ্য, বস্ত্র দিও। ওদের বক্তব্য শোন। তারপর বিচার কর।"

মহাপ্রজাবতী প্রশ্ন করলেন—"এদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে?"

বুদ্ধ বললেন—"সদয় ব্যবহার।"

সারিপুত্র তাদের অন্য একটি ভবনে রাখলেন। তাদের বক্তব্য শুনলেন পরিচালকমণ্ডলী। তাতে ছিলেন কোশলরাজ, সারিপুত্র, মোগ্‌গলায়ন, বিশাখা, মহাপ্রজাবতী, অনাথপিণ্ডদ। সব শুনে দেখা গেল তুচ্ছ কারণে (স্নানের জল কোথায় থাকবে) তাই নিয়ে বিবাদের শুরু। কৌশাম্বীর ভিক্ষুরা পূর্বকথা স্মরণ করে লজ্জা পেল। তারা শাস্তার কাছে এসে ক্ষমা চাইল। বিশাখা তাদের পরিতৃপ্ত করে খাওয়ালেন। বস্ত্র দান করলেন। কৌশাম্বীর ভিক্ষুরা মাগন্দিয়ার চরিত্র দেখে ভেবেছিল শ্রাবস্তীর মেয়েরা বুঝি এমনি কুটিল হয়। বিশাখাকে দেখে বুঝল তা নয়, শ্রাবস্তীর মেয়েরা ধার্মিকাও হয়।

মাগন্দিয়ার মত শ্রাবস্তীর আরো দুটি মেয়ে বুদ্ধকে মনঃকষ্ট দিয়েছিল। একজন চিঞ্চা, অন্যজন সুন্দরী। বুদ্ধের সুনির্মল চরিত্রে এই দুজনেই কলঙ্ক লেপতে চেয়েছিল কোশল ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে। চিঞ্চা তো বলেই বসল বুদ্ধ-সঙ্গে সে সন্তান-সম্ভবা। উদরে সে একটি কাঠের টুকরো বেঁধে বেড়াচ্ছিল। জীবক সারিপুত্রের কাছে খবর পেয়ে শ্রাবস্তী এলেন। বিশাখাকে বললেন—"ভগিনী, আপনি পরীক্ষা করুন।" বিশাখা পরীক্ষা করতে যাবেন এমন সময় মোগ্‌গলায়ন অট্টহাস্য করে উঠলেন। একটা ঝোড়ো হাওয়া প্রচণ্ড জোরে বয়ে গেল।

চিঞ্চার উদয় থেকে কাঠের টুকরোটি ছিঁড়ে মাটিতে পড়লো। চিঞ্চা দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালালো।

এর পরেও ব্রাহ্মণেরা ছাড়লো না। তারা সুন্দরীকে হত্যা করে জেতবনের কাছে রেখে বুদ্ধের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো। কিন্তু একথা কেউ আর বিশ্বাস করলো না।

চিঞ্চা এবং মাগন্দিয়া বুদ্ধকে খুব দুঃখ দিয়েছিল। এজন্য তাঁর মত শান্ত, সংযত এবং ধীর ব্যক্তিও বলেছিলেন—"এরা নিরয়গামী হবে।"

* * *

শ্রাবস্তীতে থাকতেই বুদ্ধ রাহুলকে উপসম্পদা দিলেন। বুদ্ধ পুত্রকে মৈত্রী-ভাবনা সম্বন্ধে উপদেশ দেন—"প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু অবেরা হোন্তু।' সকল প্রাণী সুখী হোক। শত্রুহীন হোক। অহিংসিত হোক। সকল প্রাণী নিজ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। হে রাহুল, মৈত্রী-ভাবনা করলে বিদ্বেষ দূর হয়। করুণা-ভাবনা দ্বারা হিংসা দূর হয়। মুদিতা-ভাবনা দ্বারা শত্রুভাব দূর হয়। উপেক্ষা-ভাবনা দ্বারা রাগ দূর হয়।"

শ্রাবস্তীতে হঠাৎ এক দস্যুর উপদ্রব শুরু হলো। নাম অঙ্গুলিমাল। সে নাকি মানুষ হত্যা করে যথাসর্বস্ব হরণ করত এবং তার হাতের একটি আঙ্গুল কেটে নিয়ে মালা গেঁথে পরতো। মহারাজ প্রসেনজিৎ রক্ষীবাহিনী, নগরপাল, গ্রামকূট সবাইকে বলে পাঠালেন দস্যু দমন কর। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারলো না। এদিকে হঠাৎ হঠাৎ দুঃসংবাদ আসতে লাগলো, অমুক শ্রেষ্ঠীর হাতের আঙুল গেছে ; অমুক বণিক নিহত হয়েছে , অমুক চাষীর মৃতদেহ নালার ধারে পড়ে আছে। বুদ্ধ একদিন কাউকে কিছু না বলে অচিরাবতী নদীর ধারে যে বন আছে তাতে চলে গেলেন। যাচ্ছেন, যাচ্ছেন, য্যচ্ছেন। দস্যু তাঁর পিছু নিল। কিন্তু বুদ্ধ

এত দ্রুত চলছিলেন যে দস্যু সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়েও তাঁকে ধরতে পারছিল না। তখন সে চেঁচিয়ে বললো—"শ্রমণ, স্থির হও।"

বুদ্ধ চলতে চলতে বললেন—"তুমি স্থির হও। আমি তো স্থির হয়েই আছি।"

দস্যু বিস্মিত। সে দাঁড়িয়ে, অথচ বুদ্ধ তাঁকেই বলছেন—"স্থির হও।" নিজে চলছেন, অথচ বলছেন, স্থির আছেন। এর অর্থ কি?

বুদ্ধ বললেন—"আমি সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়াবান—এজন্য আমি সর্বদা স্থির। তুমি সকলের প্রাণ হরণ কর, তাই তুমি সর্বদা অস্থির। তুমি স্থির হও।"

দস্যু তো অবাক। শ্রমণ বলে কি? এত বড় সাহস যে আমার মুখের ওপর কথা বলে? তাকিয়ে দেখল সূর্যের মত উজ্জ্বল এক ব্যক্তি ক্রমে বড় হচ্ছে—আরো বড় হচ্ছে। তখন সে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। বললো—"ভগবন্, আপনি আমাকে ত্রাণ করুন।"

বুদ্ধের নির্দেশে সে জেতবনে এলো। বুদ্ধ তাকে দীক্ষা দিলেন। সন্ধ্যায় উপদেশ দেবার সময় প্রসেনজিৎ এলেন। বুদ্ধের কাছে তিনি দস্যুপ্রসঙ্গ তুললেন। বললেন—"সীমান্তরক্ষী, নগরপাল তাকে সর্বত্র খুঁজছে।" এবার তিনি পদস্থ কর্মচারীদের বলেছেন, "যে করে হোক অঙ্গুলিমালকে ধর।"

বুদ্ধ বললেন—"রাজন্, চিন্তার কিছু নেই। অঙ্গুলিমাল এখানেই আছে।" বলে দেখিয়ে দিলেন।

প্রসেনজিৎ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তিনি নিজেকে কোনো রকমে সামলিয়ে বললেন—"অঙ্গুলিমাল, তোমাকে আমি অনেক জমি দেব। ধন দেব। বাস্তু দেব। তুমি চাষবাস করে খাও।"

অঙ্গুলিমাল বললো—"মহারাজ, বুদ্ধনির্দেশে আমার কিছুই দরকার নেই। এই তিনখণ্ড চীবর যে দেখছেন—এই আমার যথেষ্ট।"

প্রসেনজিৎ স্তম্ভিত। সারিপুত্র মৃদু হাস্য করে চলে গেলেন।

*   *   *

অনাথপিণ্ডদের গৃহে শান্তি নেই। স্ত্রী দাম্ভিকা। এক ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ এসেছে—অবাধ্য। এক ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেম—অতি সুপুরুষ, কিন্তু পরদারগামী। দুবার দুবার প্রসেনজিতের সভায় তার অর্থদণ্ড হয়েছে। প্রসেনজিৎ শেষ পর্যন্ত বলেছেন—"মহাশ্রেষ্ঠীর জন্য আমার দুঃখ হয়।" অনাথপিণ্ডদের তো পিতা মাতা সবই বুদ্ধ। তিনি শাস্তার চরণে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। বুদ্ধ তাঁকে শান্ত করে বললেন—"যাও, অবাধ্য পুত্রবধূকে নিয়ে এস।" সুজাতা এল। বুদ্ধ তাকে সংসারে গৃহিণীর কর্তব্য কি বোঝালেন—

"বৎসে, সংসার সৃষ্টি তোমারি প্রতিভা। এও তপস্যা। এখানেই তো নারীত্বের পরীক্ষা। তুমি যদি সবাইকে প্রীতি দিয়ে সেবা দিয়ে প্রিয় হতে পার, শ্রমণের তপস্যার ফল তুমি পাবে।"

বধূটি নম্র হলো। ক্ষেমকে ডেকে বললেন—"তুমি রোজ আমার কাছে এসে একটি ধর্মপদ শুনবে। প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা মহাশ্রেষ্ঠীকে শোনাবে। এর জন্য মহাশ্রেষ্ঠী তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা দেবেন।"

ক্ষেম ধীরে ধীরে সংযত হলো।

*   *   *

বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরলেন।

জীবকের মনে হলো বুদ্ধ সূর্য। দেবদত্ত ঝড়। ঝড় সূর্যকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। একটা চক্রান্ত চলছে। জীবক যেন তার কিছু কিছু আভাস পাচ্ছে। দেবদত্ত চাইছেন সঙ্ঘের কর্তা হতে।

অজাতশত্রু চাইছেন মগধের রাজা হতে। দুজনের মধ্যে একটা অশুভ মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে।

দেবদত্ত বুদ্ধের কাছে গিয়ে একদিন বললেন—"সঙ্ঘের ভার আমাকে দিন। শ্রমণেরা বিলাসী হয়ে যাচ্ছে। তাদের গাছের তলায় শুয়ে থাকা উচিত, বিহারে নয়। তাদের শ্মশানের পরিত্যক্ত বস্ত্র পরা উচিত—বিশাখার দেওয়া চীবর নয়।"

বুদ্ধ বললেন—"দেবদত্ত, তুমি নিজেই নিজেকে জান না। তুমি সংঘভার চাইছ? আমি সারিপুত্রকেই সংঘভার দেই নি। খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি এগুলি বড় কথা নয়। বিবেকই বড় কথা। লক্ষ্য নির্বাণ।"

ক্ষুব্ধ দেবদত্ত দশবল কাশ্যপের কাছে গেলেন। দশবলের মনে ক্ষোভ ছিল বুদ্ধ সারিপুত্রকে তাঁর দক্ষিণহস্ত অগ্রশ্রাবক ও মোগ্‌গলায়নকে বামহস্ত অগ্রশ্রাবক করেছেন। এদের সংঘে এনেছিলেন অশ্বজিৎ। বুদ্ধ তাঁকেও ভালবাসেন। সারিপুত্র অশ্বজিৎকে প্রতিদিন বন্দনা করে সব কাজ করেন। মহানাম এবং কৌণ্ডিণ্য তো প্রথম থেকেই বুদ্ধের প্রিয়। দশবল কাশ্যপের সেই অভিমানে দেবদত্ত নাড়া দিলেন। দশবল তাঁকে কয়েকটি ঋদ্ধি শেখালেন। দেবদত্ত তা সম্বল করে অজাতশত্রুর কাছে গেলেন। কখনো হস্তী হয়ে প্রাসাদে ঢুকে বেরিয়ে গেলেন, কখনো অশ্ব হয়ে প্রাসাদে ঢুকে বেরিয়ে গেলেন। কখনো বিষধর সর্পকে বশ মানালেন, মত্ত হস্তী দমন করলেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের শক্তি দেখে চমৎকৃত। স্থির হলো অজাতশত্রু মগধরাজ্য অধিকার করবেন। দেবদত্ত সংঘ অধিকার করবেন। এর পর অজাতশত্রু গিয়ে রাজা বিম্বিসারকে বললেন—"আমি বহুদিন অঙ্গরাজ্য পরিচালনা করেছি। এখন আমাকে মগধরাজ্য চালনা করতে দিন।"

পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা বিম্বিসার বললেন—"আচ্ছা, তাই হবে। তুমি মগধ শাসন কর। কিন্তু রাজকোষ আমার থাকবে।"

জীবকের মনে হলো মহারাজ ভুল করলেন। কারণ অজাতশত্রুর হাতে রাজ্যের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীও চলে গেল। এদিকে দেবদত্ত আর কোকিলাক্ষ একশত নবীন শ্রমণ নিয়ে বিহার ত্যাগ করে গয়াশীর্ষে চলে গেলেন। বুদ্ধ খবর পেয়ে খুব বিরক্ত হলেন। সারিপুত্র বললেন—"প্রভু, আমি আর মোগ্গলায়ন এখুনি গয়াশীর্ষে যাচ্ছি, বিদ্রোহীদের নিয়ে আসব।" তাঁরা গয়াশীর্ষে গেলেন। দেখলেন—দেবদত্ত সেখানে বুদ্ধের অনুকরণে উপদেশ দিচ্ছেন। দুই অগ্রশ্রাবককে দেখে দেবদত্তের আনন্দ তো ধরে না। বললেন—"তোমরাও থাক। উপদেশ দাও।" সারিপুত্র দু চারদিন উপদেশ দিলেন। তারপর একদিন সময় বুঝে দেবদত্ত যখন নিদ্রিত তখন সেই নবাগত শ্রমণদের নিয়ে রাজগৃহে ফিরে এলেন। কোকিলাক্ষ তখন সেখানে ছিলেন না। ফিরে এসে দেখেন বিহার শূন্য। দেবদত্ত নিদ্রিত। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি দেবদত্তের তলপেটে পদাঘাত করলেন। দেবদত্ত আচমকা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে রক্তবমন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হয়ে কোকিলাক্ষকে ত্যাগ করে দেবদত্ত চলে এলেন রাজগৃহে।

এরপর বৈভার পাহাড়ে শকুন্ত বিহারে দেবদত্ত উপদেশ দান শুরু করলেন। উপদেশ মানে নিত্য বুদ্ধনিন্দা।

বুদ্ধ তখন পুনরায় উদরশূলে কষ্ট পাচ্ছিলেন। জীবক তাঁকে ত্রিকটু সাগু খাইয়ে একটু ভাল রেখেছেন। দেবদত্তের কাণ্ড শুনে বুদ্ধ বললেন—

"আপনারে সবে ভাবে আধুনিক শিখিয়া নিন্দাতত্ত্ব
জানে না এ প্রথা বহু যুগ ধরে মানুষের করায়ত্ত।"

কিন্তু দেবদত্তকে নিরস্ত করা গেল না। তিনি অজাতশত্রুকে কূট পরামর্শ দিতে লাগলেন।

অজাতশত্রু একদিন সৈন্যপরিবৃত হয়ে খোলা তলোয়ার হাতে বিম্বিসারের কাছে গিয়ে বললেন—"মগধের রাজকোষ আমাকে দিন।" অসহায় বিম্বিসার রাজকোষ দিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। কার্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমীতে শুরু হলো উত্থান। বুদ্ধ গৃধ্রকূট পর্বতে ভোরবেলা পায়চারি করছিলেন। দেবদত্তের নিযুক্ত ঘাতক, উপক, যন্ত্রচালিত ক্ষেপনাস্ত্র ঘুরিয়ে বুদ্ধের দিকে একটি শিলা ছুঁড়ল। শিলাটি আর একটি পাথরে লেগে দুই খণ্ড হয়ে গেল। তার টুকরো বুদ্ধের চরণে বিঁধল। তিনি পড়ে গেলেন। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। আনন্দ, কৌণ্ডিণ্য ছুটে এলেন। বুদ্ধের ওঠবার শক্তি ছিল না। তাঁরা তাকে মণ্ডশিবিকাতে শুইয়ে ধরাধরি করে গুহায় নিয়ে এলেন। জীবক খবর পেয়ে ছুটে এলেন। শল্য চিকিৎসা করে প্রস্তরখণ্ড বের করা হলো। ধৌত বস্ত্রে ক্ষতস্থান বাঁধা হলো। তবু রক্ত বন্ধ করা গেল না। ক্রমে প্রভু নির্জীব হয়ে পড়লেন। জীবক ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, বললেন—"আনন্দ, কি করে তরুণী মায়ের দুধ পাওয়া যায়?"

আনন্দ হতবাক। তিনি শ্রমণ—সন্ন্যাসী। তরুণী মায়ের সন্ধান কি করে পাবেন? হঠাৎ জীবকের মনে পড়লো রাণী রঙ্গনায়কীর কথা। সম্প্রতি তাঁর একটি শিশু সন্তান হয়েছে। জীবক রথ হাঁকিয়ে প্রাসাদে চললেন। কিন্তু ততক্ষণে উত্থান শুরু হয়ে গেছে। শালবতীর দিকেও শিলাখণ্ড ছোঁড়া হয়েছে এবং তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর গৃহের সম্মুখে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের ঘোর সংঘর্ষ চলছে। ব্রাহ্মণদল নটিমুখ্যার দেহ শেষকৃত্যের জন্য শ্মাশানে নিয়ে যেতে চায়। বৌদ্ধরা সম্মত হয় না। এই নিয়ে সংঘর্ষ। এই সুযোগ অজাতশত্রু নিতে দ্বিধা করলেন না। প্রাসাদে রটে গেল ব্রাহ্মণেরা রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করতে আসছে।

অজাতশত্রু বললেন—"পিতা, ব্রাহ্মণবিদ্রোহ শুরু হয়েছে। বাঁচতে চান তো কারাগারে আশ্রয় নিন। কিছুদিন লুকিয়ে থাকুন।"

আসলে তিনি বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করলেন। তারপর রক্ষীবাহিনীকে আদেশ করলেন—"শালবতীর দেহ উদ্ধার কর। বৌদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা কর। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র যজ্ঞানলে ভস্ম কর।"

অশ্বারোহী বাহিনী এসে শালবতীর গৃহ বেষ্টন করলো। ব্রাহ্মণদল তাদের দেখে পলায়ন করলো। বৌদ্ধরা কিন্তু সহজে হার মানলো না। রাজপথ দিয়ে তাদের রক্তস্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো। অলিন্দে বীণার উপর পড়ে ছিল শালবতীর নিষ্প্রাণ দেহ। সৈন্যরা তুলে নিয়ে চললো শ্মশানে।

জীবক সেই সময় সেখানে পেঁছিলেন। জীবিত কালে যাকে কখনো দেখেননি—সেই মৃতা মায়ের মুখ দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে এলো। 'মা' বলে ডাকবার ইচ্ছে হলো। তিনি জোর করে নিজেকে সংযত করলেন। তিনি না বুদ্ধশিষ্য!

সৈন্যদের পিছু পিছু তিনি শ্মশানে গেলেন।

দেখলেন শ্মশানে স্বয়ং অজাতশত্রু উপস্থিত। ললাটে রক্তচন্দনের রাজতিলক। জীবক বিস্মিত। তবে কি বিম্বিসার জীবিত নেই? কূটনৈতিকের মতো চুপ করে রইলেন। নটিমুখ্যার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হলো। অজাতশত্রু জীবককে ডেকে বললেন—"যে কোন মুহূর্তে ব্রাহ্মণেরা বিম্বিসারকে হত্যা করতে পারে, তাই তাঁকে কারাগৃহের অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকতে বলা হয়েছে।"

জীবক মৌন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো তরুণী মায়ের দুধের কথা। রঙ্গনায়কীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাতেই অজাতশত্রু রাজি হলেন।

জীবক রাণী নায়কীকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—"আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো ?"

রঙ্গনায়কী ভুরু তুলে বললেন—"কি ইচ্ছা ?"

"রাণী হওয়া।"

"আমি তো হতে চাই রাজমাতা।"

"ধীরে ধীরে।"

"ধৈর্য তো ধরেই আছি। এখন বলুন, কি চাই ?"

"স্তনদুগ্ধ"।

"কেন ?" নায়কী বিস্মিত।

"ভগবান পান করবেন।"

"কেন ?"

"যে পাথরের টুকরো বিম্বিসারকে সিংহাসনচ্যুত করেছে—সেই টুকরোই নটিমুখ্যার বক্ষ বিদীর্ণ করেছে—সেই টুকরোই ভগবানের চরণে বিদ্ধ হয়েছে। রক্ত পড়া কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে আমার চিন্তা হচ্ছে।" জীবকের স্বরে উদ্বেগ।

নায়কী কুপিতা হয়ে বললেন—"কার এত সাহস যে ভদন্তের গায়ে হাত দেয় ?"

জীবক মৃদু হেসে বললেন—"সে অনুসন্ধানের ভার আপনার।"

নায়কী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর জানতে বাকি ছিল না ভদন্তকে হত্যার চক্রান্তে তাঁর স্বামী লিপ্ত। তিনি পাশের ঘরে গেলেন। একটি সুবর্ণ পাত্রে স্তনদুগ্ধ নিয়ে এলেন। পাত্রটি হাতে নিয়ে জীবক গাঢ়স্বরে বললেন—"আমি স্পষ্ট দেখছি আপনি রাজমাতা হবেন।"

তিনি গৃধ্রকূটে ফিরে গেলেন। বুদ্ধকে দুগ্ধ পান করালেন।

* * *

তিনদিন তিনরাত ধরে চললো বৌদ্ধনিধন। বহু বৌদ্ধ রাজগৃহ ত্যাগ করে চলে গেলো। বহু বিহার ধ্বংস হলো। এই

তিনদিন জীবক বুদ্ধের কাছে রইলেন। বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে বললেন—"দেবদত্তকে বল বক্র না থেকে ঋজু হতে।"

তিনদিন পরে জীবক গৃহে ফিরলেন। অভয় বললেন—"ভদন্ত কেমন আছেন?"

"ভাল।"

"রাজা বিম্বিসার বন্দী হয়েছেন, শুনেছ?"

"কারারুদ্ধ হন নি। আত্মগোপন করে আছেন মাত্র।"

"কি বলছ তুমি? অজাতশত্রু বিম্বিসারের আহার পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। রাণী বৈদেহী লুকিয়ে চুলের চূড়ার মধ্যে কৌটোয় ভরা খাদ্য আর পায়ের ফাঁপা নূপুরের মধ্যে পানীয় জল নিয়ে যাচ্ছেন। শুনছি, অজাতশত্রু সে খবরও পেয়েছেন।"

শুভা এসে উপস্থিত। তার চোখ দুটি কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে। সোমপ্রভা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। শুভা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল—"পিতা বাতায়ন থেকে বুদ্ধকে দেখতেন। অজাতশত্রু সেই বাতায়নও রুদ্ধ করে দিয়েছেন। আমাকে কেন কারারুদ্ধ করছে না? আমি তাহলে পিতার সেবা করতাম।"

রাণী বৈদেহীর কারাগারে যাওয়া রাজাদেশে বন্ধ হলো। সবাই চিন্তিত—কি হবে? মহারাণী কোশলদেবী বললেন—"আমি অঙ্গে অন্ন এবং ব্যঞ্জন মেখে যাব। রাজা আমাকে লেহন করে আহার করবেন।" তাই হলো। তিন চারদিন এভাবে কাটল। গুপ্তচরের কাছে সংবাদ পেয়ে অজাতশত্রু কোশলদেবীরও কারাগারে যাওয়া নিষেধ করলেন। এবার মোগ্‌গলায়ন ঋদ্ধি দেখাতে শুরু করলেন। তিনি প্রহরীদের সম্পূর্ণ যাদুগ্রস্ত করে রাখতেন। এই অবসরে রাজকুমারী শুভা গিয়ে পিতাকে খাওয়াতেন। কিন্তু এও বেশীদিন চললো না। দেবদত্তের চরেরা রাজাকে জানালো। মোগ্‌গলায়নের প্রাসাদে প্রবেশ বন্ধ হলো।

দিনের পর দিন অনাহারে বিম্বিসার দুর্বল হয়ে যেতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর মস্তিষ্কের বিকার হলো। কখনো হাসেন। কখনো কাঁদেন। কখনো ভয়ে অট্ট চিৎকার করেন। পূর্ণ অনাহারে তিনি দশ দিন জীবিত ছিলেন।

এর মধ্যে একদিন অজাতশত্রুর শিশুপুত্র আঙুলে স্ফোটক হওয়ায় ক্রন্দন করছিল। পুত্রের ক্রন্দন থামাবার জন্য তিনি আঙুলটি চুষতে লাগলেন। এতে ফোঁড়াটা ফেটে গেল। ব্যথাও কমল। শিশুটি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রাজমাতা রাণী বৈদেহী সজল নয়নে বললেন—"তোমার পিতাও তোমাকে শিশু-কালে এমনি আদর করতেন।"

হঠাৎ অজাতশত্রু যেন শৈশবে ফিরে গেলেন। কেঁদে উঠলো তাঁর অন্তর। তিনি মন্ত্রীদেয় ডেকে রাজা বিম্বিসারকে কারামুক্ত করে আনতে বললেন।

মন্ত্রীরা তখুনি নিশান উড়িয়ে, বাদ্য বাজিয়ে বিম্বিসারকে সম্বর্ধনা করবার জন্য কারাগৃহে গেলেন। বাইরে কোলাহল শুনে বিকৃত মস্তিষ্ক, অনাহারে ক্ষীণ, বিম্বিসারের মনে হলো অজাতশত্রু তাঁকে হত্যা করতে আসছেন। দিশাহারা হয়ে তিনি কারাগৃহের দ্বার খুঁজতে গিয়ে পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলেন। প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর মস্তিষ্ক ফেটে গেল। রক্তাপ্লুত বিম্বিসার পাথরের মেঝের উপর গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল। মন্ত্রীরা প্রবেশ করে দেখলেন রাজা বিম্বিসার ইহজগতে আর নেই।

এই সংবাদ শুনে ক্রন্দন করতে করতে অজাতশত্রু মায়ের কাছে ছুটে গেলেন। মহারাণী বৈদেহী চোখের জল ফেলতে লাগলেন। রাণী কোশলদেবী সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দুদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করলেন। সমগ্র রাজগৃহে শোকের ছায়া নেমে এলো।

অভয় চোখের জল ফেলে বললেন—"কেন এমন হলো ?"
জীবক বললেন—"কর্ম ।"

একটু পরে বললেন—"মহারাজ যুবরাজকে একে একে সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। অঙ্গের উপরাজত্ব, মগধের সিংহাসন, রাজকোষ। এটা ঠিক হয় নি।"

বুদ্ধের হৃদয়ে কি আঘাত লাগল, কেউ বুঝতে পারলো না। তিনি শুধু বললেন—"রাজা বিম্বিসার স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন।"

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রতিশোধ নিতে কাশীরাজ্য অধিকার করলেন। মগধের সঙ্গে কোশলের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বুদ্ধ বিব্রত বোধ করলেন। বিম্বিসার তাঁর শিষ্য—কোশলরাজও তাঁর শিষ্য। উভয় রাজ্যের যুদ্ধ কি বাঞ্ছনীয় ? তিনি তাঁর দক্ষিণহস্ত অগ্রশ্রাবিকা বিম্বিসারমহিষী রাণী ক্ষেমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—"তুমি প্রসেনজিৎকে যুদ্দ বন্ধ করতে বল।"

ক্ষেমা বললেন—"আমি বলি কি প্রসেনজিৎ তাঁর কন্যা বজ্রার সঙ্গে অজাতশত্রুর বিবাহ দিন, আর বিবাহে কাশীগ্রাম যৌতুক দিন, যেমন একদিন রাজা মহাকোশল কোশলদেবীকে যৌতুকস্বরূপ কাশী দিয়েছিলেন।"

বুদ্ধ বললেন—"উত্তম। আমি শীঘ্রই শ্রাবস্তী যাচ্ছি। অনাথপিণ্ডদের ভাই সুভূতি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।"

* * *

ইতিমধ্যে দেবদত্ত বিম্বিসারের মৃত্যু ঘটানোর জন্য অজাতশত্রুর কাছে পুরস্কার দাবী করলেন। অজাতশত্রু সমস্যায় পড়লেন। দেবদত্তকে চটাতে সাহস করলেন না।

"তুমি কি চাও ভদন্তের মৃত্যু ?"

"হ্যাঁ।"

তিরিশজন ধানুকীকে ডেকে অজাতশত্রু বললেন—"দেবদত্ত যা বলবেন তোমরা তাই করবে।"

দেবদত্ত শর্কর বলে এক ধানুকীকে বললেন—"তুমি আজই অপরাহ্নের উপদেশের পূর্বে শাস্তা যখন পায়চারি করেন তখন তাকে হত্যা করবে। বর্শা দিয়েই হোক বা তরবারি দিয়েই হোক। তারপর পাণ্ড্যাগিরি দিয়ে নামবে। মনে রেখো।"

শর্কর চলে গেল।

তখন দেবদত্ত আরো দুজন ধানুকীকে ডেকে বললেন—"তোমরা পাণ্ড্যাগিরির তলদেশে অপরাহ্নে থাকবে। শর্কর এলেই তাকে হত্যা করবে। তারপর ঋষিগিরির তলদেশে চলে আসবে।" তারা চলে গেল।

তখন আর চারজন ধানুকীকে বললেন—"ঋষিগিরির তলায় থাকবে। দুজন লোক এলে তাদের হত্যা করবে।"

এইভাবে বিভিন্ন স্থানে ধানুকীদের তখনি নিযুক্ত করলেন যাতে সব ব্যাপারটা গোপন থাকে।

ধানুকী শর্কর বুদ্ধকে হত্যা করতে গেল। অপরাহ্নের মধুপিঙ্গল আলো তাঁর পীতবর্ণ চীবরে পড়ে তাঁকে দেখাচ্ছিল দেবতার মতো। শর্কর মুগ্ধ! বুদ্ধকে হত্যা করতে তার হাত উঠলো না। সে গিয়ে বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। বুদ্ধ তাঁকে শান্ত করে সব কথা শুনে নিলেন, তারপর তাকে উপদেশ দিলেন। সে শান্ত হলো। বলল সে শ্রমণ হবে। বুদ্ধ তাকে চীবর দিলেন। ঠিক সেই সময় পাণ্ড্যাগিরির নীচে যে দুজন ধানুকী ছিল তারা এসে উপস্থিত। তারাও শর্করের মত বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়লো। তিনি তাদেরও উপদেশ দিলেন। তারাও সঙ্ঘগত হলো।

পরদিন দেবদত্ত সব শুনে বুঝলেন বুদ্ধের অলৌকিক শক্তি আছে। মানুষের সাধ্য নেই তাঁকে হত্যা করে। তাই ঠিক করলেন এবার পশুশক্তির সাহায্য নেবেন।

অজাতশত্রুর নলগিরি বলে একটি দুষ্ট হাতি ছিল। দেবদত্ত সেই হাতিটি চাইলেন। রাজা সম্মত হলেন। জীবক খবর শুনে

নলাগিরির পালককে ডেকে বললেন—"নলাগিরিকে যখন মদ খাওয়াবে তখন এই ঘুমের ওষুধটি মিশিয়ে দেবে।" তারপরেই তিনি গৃধ্রকূটে গিয়ে বুদ্ধকে সতর্ক করে দিলেন। বুদ্ধ যেমন ভিক্ষার জন্য প্রতিদিন সকালে বার হন তেমনি রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন—এমন সময় কোলাহল শুনলেন। দেখলেন, কিছু লোক প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদের পেছনে নলাগিরি শুঁড় তুলে রক্তচক্ষু করে ছুটে আসছে—যেন এক বিশাল পর্বত। বুদ্ধ হাত তুলে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'নলাগিরি, থাম।" কি আশ্চর্য। নলাগিরি বুদ্ধকে দেখে শুঁড় নামিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র থেকে গুড় মেশানো চালের একটি মণ্ড তাকে খেতে দিলেন। নলাগিরি খুব খুশি হয়ে খেল। সে আবার শুঁড় বাড়ালে বুদ্ধ আরো একটি মণ্ড দিলেন। সে সেটি খেয়ে বুদ্ধের চরণতলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে জীবক হস্তীপালককে নিয়ে এলেন। সে এসে হাতিটির পায়ে ও গলায় বন্ধনী পরিয়ে কাছের একটি আমগাছে বেঁধে রাখলো যাতে নলাগিরি ঘুম থেকে উঠে আবার ছুটোছুটি না করে।

জীবক সব কথা রাণী শ্রঙ্গনায়কীকে জানালেন। বললেন—"মহারাণী, পিতৃহত্যার জন্য মগধরাজের দুর্নামের অন্ত নেই। বুদ্ধহত্যা করলে আর ওঁাকে সিংহাসনে বসতে হবে না। কেন উনি ঐ কুটিল দেবদত্তকে প্রশ্রয় দেন? সময় থাকতে বুঝিয়ে বলুন মহারাজকে।"

নায়কী অজাতশত্রুর সঙ্গে বজ্রার বিবাহ প্রসঙ্গে ক্ষিপ্তা হয়েই ছিলেন। এখন সূত্র পেয়ে তিনি রাজাকে অনেক বচন শোনালেন। বার বার বললেন, ভদন্তর মৃত্যু অর্থাৎ রাজারও মৃত্যু। উপায়? দেবদত্তকে ত্যাগ।

অজাতশত্রু দেবদত্তের প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ করে দিলেন। অন্য দিনের মত দেবদত্ত সকালে প্রাসাদে প্রবেশ করতে গেলে

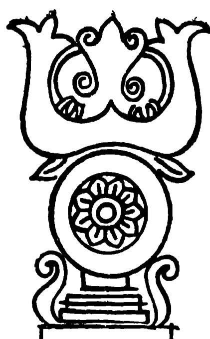
প্রহরীরা বাধা দিল। কিন্তু তিনি দেখলেন ভিক্ষুনী উৎপলবর্ণা প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। শুধু তাই নয়, কিছুক্ষণ পরে ভিক্ষা নিয়েও ফিরলেন। দেবদত্তকে প্রবেশদ্বারে দেখে উৎপলবর্ণা মৃদু হাস্যে বললেন—(তিনি জানতেন না দেবদত্তের জন্য প্রাসাদ রুদ্ধ)—

"দিবস রজনী নিত্য যাহারা বুদ্ধ চিন্তাগত
প্রবুদ্ধ তারা বুদ্ধশিষ্য সদা রণজাগ্রত।"

নারী সম্বন্ধে দেবদত্তের মনে রুদ্ধ কামনা ছিল। উৎপলবর্ণার এই কথায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি তাঁর মস্তকে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎপলবর্ণার প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ে গেল।

পথে দাঁড়িয়েছিল একটি চালকহীন রথ। দেবদত্ত লাফিয়ে সেই রথে চড়ে রাজগৃহ থেকে পলায়ন করলেন। অজাতশত্রু শুনে রক্ষীবাহিনী পাঠালেন দেবদত্তকে ধরে আনার জন্য। কিন্তু দেবদত্ত কোথায়?

উৎপলবর্ণার মৃত্যুতে বুদ্ধ ক্ষুব্ধ। রাণী ক্ষেমা যেমন তাঁর দক্ষিণহস্ত অগ্রশ্রাবিকা—উৎপলবর্ণা তেমনি ছিলেন তাঁর বামহস্ত অগ্রশ্রাবিকা। তিনি স্থির করলেন, আর নয়, রাজগৃহ ছাড়বার সময় এসেছে।



বুদ্ধ শ্রাবস্তী এলেন। আবার উঠলেন জেতবন বিহারে।

আহা! শান্তির রাজ্য। মাঠের আনন্দ সবুজ ঘাস হয়ে উঠেছে। লতার আনন্দ ফুল হয়ে ফুটেছে। অচিরবতীর নদীর আনন্দ ঢেউ তুলে চলেছে। সর্বম্ অস্তি—শ্রাবস্তী। সব পেয়েছির দেশ। রাজগৃহের অন্ধকারের পর কোশল যেন আলোর রাজ্য।

বুদ্ধ রোজই ধর্মোপদেশ শোনাচ্ছেন। রাজা প্রসেনজিতের রাণী মল্লিকা ও পুত্র বিরুধকের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। বুদ্ধ রাজার এই দোষ খণ্ডনের জন্য তাঁকে 'পিয়বগ্‌গ' শোনাচ্ছিলেন।

"মহারাজ, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয় ভাল। প্রিয় অপ্রিয় দুই বোধই ত্যাগ করতে হবে। প্রিয় অপ্রিয় বোধ যার অতীত সেই শ্রেয়কে পায়।

প্রিয়জন হতে শোকের জন্ম, প্রিয়জন হতে ভয়,
প্রিয়-বিমুক্ত যে জন তাহার নাহি শোক নাহি ভয়।"

প্রসেনজিৎ শুনছিলেন। কিন্তু বুঝছিলেন না।

তিনি বিম্বিসারের মতই ভুল পথে যাচ্ছিলেন। পুত্রস্নেহ তাঁকেও অন্ধ করেছিল। বিম্বিসার যেমন অজাতশত্রুকে চম্পার উপরাজা করেছিলেন—প্রসেনজিৎও তেমনি বিরুধককে বিদেহের উপরাজা করলেন। সকলের ভয় বিরুধক না অজাতশত্রুর মত পিতাকে হত্যা করে রাজা হয়ে বসেন।

এদিকে বিরূধকের জননী রাণী মল্লিকার প্রতি প্রসেনজিতের দুর্মর আসক্তির কথা সর্বজনবিদিত। রাণী মল্লিকা সুন্দরী—এজন্য অনেকেই তাঁকে ঈর্ষ্যা করত। ভয়ও পেত। বুদ্ধ তাই বার বার প্রসেনজিতকে সম্যক দৃষ্টির কথা শোনাতে লাগলেন।

* * *

অনাথপিণ্ডদ জানালেন রাণী মল্লিকা রাজার পাঁচশত অমাত্যের মধ্যে তিনশতকে নিজের দলে নিয়ে নিয়েছেন।

বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন—"মহামাত্য দীর্ঘচারায়ণ কার পক্ষে?"

"রাণী এখনো তাঁকে নিজের দলভুক্ত করে করে উঠতে পারেন নি।"

"তাহলে ততদিন কোশলরাজের কোন ভয় নেই।"

অনাথপিণ্ডদ চিন্তিত মুখে বললেন—"ভয় আছে। ভদন্ত, আপনার নিশ্চয় মনে আছে সেনাপতি বন্ধুক মল্ল ও তাঁর পুত্রদের প্রসেনজিৎ কৌশলে প্রত্যন্ত প্রদেশে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন। দীর্ঘচারায়ণ এই বন্ধুক মল্লের ভাগিনেয়। তাঁকে রাজা যখনই নিযুক্ত করেন আমি তাঁকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু আপনি তো জানেন রাজাকে। কাউকে যদি বিশ্বাস করেন তো গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। কাউকে যদি ভালবাসেন তো পৃথিবী কাঁপিয়ে ভালবাসেন। আবার কারুর উপর কদি চটেন তো আগুন হয়ে যান। এই দীর্ঘচারায়ণ এখন চুপ করে আছে। সময়মত শোধ নেবে।"

বুদ্ধ চিন্তিত হয়ে বললেন—"মহাশ্রেষ্ঠী, তুমি একবার বিরূধককে নিয়ে আসতে পার?"

"পারি।"

বিরূধক পরদিনই এলেন। প্রভুর কাছে তিনি বিক্ষোভ দেখালেন—

"ভগবন্, কোশল এবং শাক্য উভয় দেশের লোকই আমার মা ও আমার প্রতি অন্যায় করেছে। আপনি বোধহয় জানেন রাজা

প্রসেনজিৎ একটি শাক্য কন্যাকে বিবাহ করতে চান। ভগবান্, আপনি শাক্য। রাজা প্রসেনজিৎ আপনাকে গুরু বলে এত শ্রদ্ধা করেন যে তিনি আপনার বংশের একটি কন্যা প্রার্থনা করেছিলেন। সর্বত্র তিনি বলেন, 'ভগবান্ কোশলের লোক; আমিও কোশলের লোক। ভগবান্ ক্ষত্রিয়; আমিও ক্ষত্রিয়। অতএব শাক্যকন্যার জন্য প্রস্তাব পাঠানো কি তাঁর দোষের হয়েছিল?"

"না বিরুধক, এতে দোষ হয়নি।"

বিরুধক তিক্ত কণ্ঠে বললেন—"শাক্যদের কুলগর্ব এত বেশী যে তাঁরা এই প্রস্তাবে রাজকন্যা না পাঠিয়ে পাঠালেন এক দাসী কন্যাকে।"

বুদ্ধ আপত্তি করলেন।

"না বৎস, মল্লিকা বা বাসবক্ষত্রিয়া দাসীকন্যা নয়। সে আমার জ্ঞাতিভ্রাতা মহানাম শাক্যের কন্যা। তার মা নাগমুণ্ডা অবশ্য পরিচারিকা ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যা। অবস্থা বিপাকে তাঁকে পরিচারিকার কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু পিতৃ-পরিচয়ই তো সন্তানের পরিচয়। এজন্য মহানাম তার নামের সঙ্গে 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি যুক্ত করে নাম দেন—'বাসবক্ষত্রিয়া'। বিবাহের পর তোমার পিতা তার নতুন নাম দেন—'মল্লিকা'।"

"ভগবন্, কেউ কেউ বলেন, পিতা আমার মাতার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে মুগ্ধ হয়ে মহানামকে বিবাহের প্রস্তাব দেন।"

অনাথপিণ্ডদ বললেন—"সে ঘটনা আমি জানি। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একদা মৃগয়ায় গিয়ে ক্লান্ত হয়ে মহানামের উদ্যানে প্রবেশ করেন। তখন চন্দ্রা বা বাসবক্ষত্রিয়া উদ্যানে ফুল তুলছিলেন। প্রসেনজিৎ তাঁর কাছে পা ধোয়ার জল চান। চন্দ্রা একটি বৃহৎ মাটির জালা থেকে তাঁকে উষ্ণ জল দেন। রাজা পা ধোওয়ার পর মুখ ধোওয়ার জল চান। চন্দ্রা তাঁকে এবার

ঈষদুষ্ণ জল দেন। রাজা মুখ ধুলেন। তারপর পানীয় জল চাইলেন। চন্দ্রা ঐ জালা থেকেই এবার শীতল জল দিলেন। তিনবারই এক জালা থেকে তিনরকম জল দেওয়ায় রাজা বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন—'তুমি কি যাদু জানো? একই জালা থেকে তিনরকম জল আনলে।' চন্দ্রা বললেন—'মহারাজ, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। সবই সূর্যকিরণের ফল। আপনাকে পা ধোওয়ার জন্য তপ্ত জল দিয়েছি জালার উপরিভাগ থেকে। সেখানে রৌদ্র পড়ায় জল তপ্ত হয়েছিল। জালার মধ্যভাগ থেকে জল দিয়েছি মুখ ধোবার জন্য। সেখানে সূর্যের তাপ কম প্রবেশ করায় জল ছিল ঈষদুষ্ণ। পানীয় জল এনেছি সব থেকে তলার অংশ থেকে। সেখানে রৌদ্র প্রবেশই করে নি, তাই শীতল ছিল।'

প্রসেনজিৎ উত্তর শুনে চমৎকৃত হলেন।

এরপর তিনি শয়ন করতে চাইলেন। চন্দ্রা তাঁকে সামনের ঘরে শয়ন করতে বলে দ্বার রুদ্ধ করতে যেতেই রাজা বাধা দিলেন। বললেন—'দরজা বন্ধ করছ কেন?' চন্দ্রা বললেন—'রাজাদের অনেক শত্রু থাকে। তাই বন্ধ করছি। আপনি শয়ন করে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।'

বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে প্রসেনজিৎ আরো চমৎকৃত। সত্য সত্যই সে সময় দুজন অস্ত্রধারী সৈনিক উদ্যানে আসে ও চন্দ্রাকে প্রশ্ন করে—'প্রসেনজিতকে দেখেছ?' চন্দ্রা বলেন—'হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তো এইমাত্র চলে গেলেন।'

'কোন্ দিকে গেলেন?'

চন্দ্রা উল্টো দিক দেখিয়ে দিলেন।

রাজা সব দেখে বললেন—'কন্যে, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই।'

চন্দ্রা বললেন—'পিতাকে বলুন।'

রাজা তখন চন্দ্রার পিতা মহানামকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। মহানাম বললেন—"আপনি কোশল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পাঠান।"

বুদ্ধ বললেন—"এরও আগের একটি কাহিনী আমি জানি। কপিলবাস্তুতে থাকার সময়, আমি একদিন ভিক্ষায় গেলে চন্দ্রা আমাকে ভিক্ষা দেয়। সে যখন ভিক্ষা দিচ্ছিল, তখন মনে মনে কামনা করছিল যেন তার কোন রাজা বা রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। যাতে তার মনের কামনা পূর্ণ হয় সেজন্য আমি বলেছিলাম—'তাই হোক'।"

বিরূধক বললেন—"তারপর কি হলো শুনুন।

পিতা প্রস্তাব পাঠালে কুলগর্বে অন্ধ শাক্যরা স্বজাতীয়া কন্যা দিতে রাজি হলো না। তখন মহানাম বললেন, 'আমার একটি কন্যা আছে—নাম চন্দ্রা বা বাসবক্ষত্রিরা। তার মা একজন পরিচারিকা মাত্র। তাকেই কোশলরাজের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যাক।' শাক্যরা সম্মত হলো।"

বুদ্ধ বললেন—"এটা ঠিক হয় নি। শাক্যদের উচিত ছিল স্বজাতীয়া কন্যা দান করা। দান মহৎ যজ্ঞ। কন্যা দান সুমহৎ যজ্ঞ।"

বিরূধক বললেন—"ভগবন্, আরো শুনুন। কোশলদূতের কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। সে বলল—'বাসবক্ষত্রিয়ার সঙ্গে যদি অন্য শাক্যরা আহার করেন তবেই তাঁকে কোশলে নিয়ে যাব।' চতুর মহানাম শাক্যদের ডেকে বললেন—'আমি যখন প্রথম গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করব, তখন তোমরা বাসবক্ষত্রিয়াকে সাজাবে যাতে সে দেরী করে আসে। যখন সে খেতে বসবে, আমি দ্বিতীয় গ্রাস তুলতে যাব, এমন সময় একজন এসে বলবে 'জরুরী পত্র এসেছে; এখুনি উত্তর দিতে হবে।' অমনি আমি উঠে যাব। এতে খাওয়াও হবে আবার হবেও না।"

শাক্যরা এতে সম্মত হলেন। বাসবক্ষত্রিয়ার সঙ্গে মহানাম খেতে বসলেন। পত্রও এল। তিনি উঠেও গেলেন। কোশলদূতের বিশ্বাস হলো বাসবক্ষত্রিয়া শাক্যবংশীয়া। যথাকালে সমারোহে বিবাহ হলো। কিন্তু কি করে জানি কথা উঠলো কোশলরাজ দাসী-কন্যাকে বিবাহ করেছেন। রাজমাতা তাই বধূবরণ করলেন না। কিন্তু রাণী মল্লিকা (বাসবক্ষত্রিয়া) ছিলেন বুদ্ধিমতী। শ্বাশুড়ীর উপর না রেগে তিনি প্রতিদিন প্রভাতে তাঁকে প্রণাম করতেন। কিছুদিন পরে রাজমাতা তাঁর উপর প্রসন্না হয়ে বললেন—'এত নরম যার হাত সে কি দাসীকন্যা হতে পারে ?'

মা বললেন—'আমি দাসী কন্যা নই—ব্রাহ্মণ কন্যা।'

প্রসেনজিৎ রাণী মল্লিকাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর ধারণা ছিল, রাণী মল্লিকা ভগবান বুদ্ধের মতই শাক্যবংশীয়—তার উপর তিনি বুদ্ধিমতী। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই অন্য রাণীরা তাঁকে ঈর্ষা করতেন। আমার যখন পাঁচ ছয় বছর বয়স, তখন দেখলাম আমার অন্য ভাইদের জন্য তাদের মাতামহরা খেলনার হাতি ঘোড়া পাঠাচ্ছেন। আমাকে কেউ কিছুই পাঠাচ্ছে না। আমি মাকে প্রশ্ন করলাম—'মা, আমার কি মাতামহ নেই ?'

মা বললেন—'আছে, বৎস। তবে তাঁরা দূরে থাকেন তাই খেলনা পাঠাতে পারেন না।'

যখন আমি ষোল সতের বছরের হলাম—মাকে বল্লাম—'আমি কপিলবাস্তু যাব।'

মা রাজি হলেন না। কিন্তু আমিও স্থির সংকল্প করেছি মাতামহের গৃহে যাবই। মা শেষ পর্যন্ত সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে তিনি সব কথা মহানামকে জানান। আমি আমার ব্রাহ্মণবন্ধু অম্বরীষকে নিয়ে গেলাম। শাক্যরা আমাকে সম্মান দেখালেন। তাঁদের সংস্থাগারে নিয়ে গেলেন। বহু গুরুজনের সঙ্গে দেখা হলো। মাতামহ, মাতুল, মাতুলানী, মাতামহী। প্রণাম করতে

করতে আমার পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম—এখানে আমার কনিষ্ঠ কি কেউ নেই যে আমাকে প্রণাম করতে পারে?'

শাক্যরা বললেন—'তোমার কনিষ্ঠেরা নগরের বাইরে বনভোজনে গেছে তাই তাদের দেখতে পেলে না।'

মধ্যাহ্নভোজনের পয় আমরা ফিরলাম। নগরের বাইরে প্রায় পৌঁছে গেছি এমন সময়ে অম্বরীষ বললো যে তার তরবারি ফেলে এসেছে। আমরা তখন একটি উদ্যানে বিশ্রাম করলাম। সে ফিরে গেল। সে দেখল একজন দাসী আমি যে কাষ্ঠফলকাসনে বসে আহার করেছিলাম সেটি ধৌত করতে করতে বলছে—'দাসীপুত্র খেয়েছে, তাই আমার কাজ বেড়েছে।' অম্বরীষ কৌতূহলী হয়ে এ কথার রহস্য কি জানতে চাইল। দাসীটি সব উদ্‌ঘাটিত করল।

অম্বরীষের মুখে সব শুনে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে উদ্যানের গাছ-পালা ভাঙতে লাগলাম। খবর পেয়ে শাক্যপ্রহরী দৌড়ে এল এবং আমাদের প্রহার করতে লাগল। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

পিতা সব শুনে মা ও আমাকে দাস-দাসীর মত অর্থ দিতে লাগলেন। অন্য রাণীদের আনন্দের অবধি রইল না।"

বিরূধকের ক্ষোভে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো। বুদ্ধ বললেন—"বৎস, এটা রাজা ঠিক করেন নি। আমি এ বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করি, কারণ তোমার মা মল্লিকা কখনোই দাসীকন্যা নয়। সে শাক্যকন্যা। মহানামের কন্যা। তুমিও দাসীপুত্র নও। স্বয়ং রাজা প্রসেনজিতের তুমি পুত্র। উভয়েই ক্ষত্রিয়। বৎস, ক্রোধ কোর না। রাগের সমান অগ্নি নেই—বিদ্বেষের মত দুঃখ নেই। প্রমাদ কোর না। 'অপ্রমাদেতে ইন্দ্র মহান দেবেন্দ্র নাম ধরে।' একটি পদ তোমাকে বলি।

যদি কেহ রণে সহস্র জনে সহস্র বার,
তা হতে শ্রেষ্ঠ আত্মবিজয়ী—মহৎ বুদ্ধ তার।

যদি রাজা হতে চাও বৈরীভাব পোষণ কোর না। **পঞ্চশীল** পালন কর।"

বিরূধক তখনকার মত নম্র হলেন।

*　　　*　　　*

সারিপুত্র একদিন জানালেন—"দেবদত্ত শ্রাবস্তীতে এসেছেন। তিনি অনুতপ্ত। আজ সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিতে চান।"

বুদ্ধ বললেন—"পারেন।"

সারিপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন—"তিনি কি আপনাকে প্রণাম করতে পারেন?"

বুদ্ধ এ কথায় অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। সারিপুত্র তটস্থ। অনেকক্ষণ পরে বললেন—"পারেন।"

সন্ধ্যার সময় বুদ্ধ উপদেশ দিলেন। উপাসনা শেষে দেবদত্ত এসে বুদ্ধের চরণে প্রণাম করতে গেলেন। প্রণাম করতে গিয়ে দেবদত্ত অনুভব করলেন বুদ্ধের পা দুটি পাথরের মত কঠিন। প্রাণপণে আঁচড়াতে গিয়ে তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটির নখ ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগলেন। শ্রমণেরা ছুটে এলেন। ছুটে এলেন জীবক এবং কোশলরাজের চিকিৎসক ধৈবত। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। পরীক্ষা করে দেখা গেল দেবদত্ত নখে করে সর্পবিষ এনেছিলেন, প্রণামের ছলে আঁচড়িয়ে বুদ্ধের দেহে বিষ ঢেলে দেবার জন্য। পরিবর্তে ভগ্ন নখের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ দেহেই বিষ প্রবেশ করল।

বুদ্ধ সব শুনে বজ্রগর্ভ স্বরে বললেন—"দেবদত্ত নিরয় গমন করবে।

অযতনে কুশ তুলিলে যেমন কর কর্তন করে,
মন্দপালিত শ্রমণ তেমন নিরয়ে গমন করে।"

* * *

শ্রাবস্তীতে শুরু হলো দুর্ভিক্ষ। সাধারণের ঘরে অন্ন নেই। হাহাকার। বুদ্ধ তাঁর সব শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন। ক্ষুধিতকে অন্নদান করতে হবে। এর চেয়ে বড় সেবা কিছু নেই। শ্রেষ্ঠী, মন্ত্রীবর্গ, রাজকর্মচারী সবাই মাথা নীচু করে রইলেন। নিস্তব্ধ সভাগৃহ। করুণাঘনের দুটি নয়ন ছল ছল করতে লাগল।

ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র উঠে বললেন, "ভগবন্, আমি সর্বত্র লোক পাঠিয়েছি। অন্য রাজ্য থেকে যাতে কিছু খাদ্য সংগ্রহ হয়। ভিষগরত্ন জীবক গেছেন রাজগৃহে। আমার ভগিনী চালা গেছে নালন্দা। কপিলবাস্তুতে গেছেন মহাপ্রজাবতীর কন্যা সুন্দরীনন্দা। বৈশালীতে গেছেন লিচ্ছবি নায়ক সিংহের ভাগিনেয়ী ভিক্ষুনী সিংহা।"

বুদ্ধ বললেন—"কিন্তু শ্রাবস্তীর নিজ উদ্যোগ কি? এই ক্ষুধার্ত বিশাল পুরীকে নিত্য কে খাদ্য যোগাবে?"

অনাথপিণ্ডদকন্যা ভিক্ষুনী সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়ালেন, নম্রকণ্ঠে বললেন—"আমি ভার নেব।"

অনাথপিণ্ডদ ভীত। মেয়ে বলে কি? বুদ্ধ বললেন—"তুমি?" তারপর প্রশান্তকণ্ঠে বললেন—"বৎসে, কি করে এত বড় কাজটি করবে?"

সুপ্রিয়া বললেন—"আমি ঘরে ঘরে যাব—মুষ্টি ভিক্ষা চাইব। তাতে গৃহীদের কোন কষ্ট হবে না। অথচ বুভুক্ষুরাও একমুঠো খেতে পাবে। আমার সঙ্গে যাবে শ্রাবস্তীর ভিক্ষুনীরা—পুন্নিকা, সকুলা, সোনা, দন্তিকা। সংগৃহীত তণ্ডুল রন্ধন করে সবাইকে পাঁচ হাতা করে দেব। খাদ্য বিতরণও নিয়ন্ত্রিত হবে।" বুদ্ধ প্রসন্ন হয়ে বললেন—"উত্তম।"

বুদ্ধশিষ্যরা রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, চম্পা সর্বত্র থেকে নিয়ে এল তণ্ডুল, গোধূম, যব, মুদ্গ, গুড়।

শ্রাবস্তী বেঁচে গেল। শুরু হলো বর্ষণ। বর্ষণে নিরসন হলো দুর্ভিক্ষের জ্বালা।

*   *   *

বুদ্ধ গেলেন বৈশালী।

সেখানে রোহিণী নদীর জল নিয়ে লিচ্ছবি ও কোলিয়দের মধ্যে কলহ বেধেছিল। যুদ্ধ হয় হয়। বুদ্ধ সবাইকে নিরস্ত করে কূটাগারশালায় একটি সভা ডাকলেন। সব দেশের প্রতিনিধিরা এলেন। বুদ্ধ বোঝালেন যুদ্ধ মূল্যহীন পন্থা। "যে হারে সে তো কিছুই পায় না, যে জেতে সেও সর্বস্বান্ত হয়। লোকে তার প্রতি বৈরীভাবও পোষণ করে। অর্থ যায়, প্রাণ যায়, দেশ নরকসদৃশ হয়। অতএব আলোচনা দ্বারা ঠিক কর কে কতটা জল নেবে।" আলোচনা হলো। সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্তে পেঁছিল।

সারিপুত্র বললেন—"এই হলো সম্যক কর্ম!"

*   *   *

কিন্তু আবার মেঘ ঘনাচ্ছিল শ্রাবস্তীতে। বুদ্ধ ফিরে এসেই সংবাদ পেলেন বিরূধক এবং অম্বরীষ চক্রান্ত করছে। বুদ্ধ বারবার প্রসেনজিতকে সাবধান করলেও রাজা পুত্রের মায়ায় অন্ধ হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত যা ভয় করা যাচ্ছিল তাই হলো।

কোশলরাজ একদিন মহামন্ত্রী দীর্ঘচারায়ণের সঙ্গে বুদ্ধদর্শনে এলেন। তিনি তাঁর পঞ্চ রাজচিহ্ন—মুকুট, ছত্র, গোলক, দণ্ড ও তরবারি—মন্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখে একা অভ্যন্তরে গেলেন। বুদ্ধের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করে ফিরে এসে দেখেন, দীর্ঘচারায়ণ নেই। দ্বাররক্ষী বলল—"মহারাজ, আপনি তথাগতের সঙ্গে দেখা করতে যে-ই প্রবেশ করলেন, মহামন্ত্রী তখুনি রথে চড়ে রাজভবনে চলে গেলেন।"

প্রসেনজিতের বুঝতে বাকি রইল না মহামন্ত্রীও বিরূধকের দলে চলে গেছেন। এতক্ষণে তাঁর রাজচিহ্ন পরে বিরূধক সিংহাসনে

উপবিষ্ট হয়েছেন। হয়তো তাঁকে বন্দী বা হত্যা করার আদেশপত্রও স্বাক্ষর করে ফেলেছেন। মুকুটহীন, ছত্রহীন, বুদ্ধিতে পরাজিত নৃপতি স্খলিত পায়ে রাজগৃহের পথ ধরলেন। কিছুদূর যেতেই দেখলেন বিম্বিসারভগিনী রাণী বসুসিকা ও বিরূধকমাতা রাণী মল্লিকা দুজনে কাঁদতে কাঁদতে পদব্রজে আসছেন। প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে মল্লিকাকে বললেন—"দুঃশীলা, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে তো?"

মল্লিকা রাজার প্রিয় মহিষী। এমনতর কঠিন কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে উঠলেন। কিন্তু প্রসেনজিৎ তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। রাণী বসুসিকার হাত ধরে রাজগৃহের অভিমুখে চললেন। রাজমাতা মল্লিকা রোদন করতে করতে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

প্রসেনজিৎ বসুসিকাকে নিয়ে রাজগৃহে এলেন। পায়ে হাঁটা তো তাঁদের কোনদিন অভ্যাস ছিল না। তদুপরি তাঁরা প্রৌঢ়। প্রসেনজিৎ খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন। সম্মুখের একটি উদ্যানে বসলেন। রাণীকে বললেন—"তুমি প্রাসাদে যাও। সব বল। অজাতশত্রুর মনোভাব বোঝ। যদি দেখ অনুকুল, তাহলে আমাকে নিয়ে যেও।" রাণী প্রাসাদে গেলেন। অজাতশত্রুকে সব বললেন। এক সঙ্গে অজাতশত্রু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—আবার তাঁর জামাতা। বসুসিকার কথায় অজাতশত্রু হতবাক। তিনি মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো কোশলরাজকে অভ্যর্থনা করে আনা হোক। মন্ত্রীরা চললেন কোশলরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে।

এদিকে প্রসেনজিৎ দেরী হচ্ছে দেখে খুবই বিষণ্ন বোধ করছিলেন। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত রাজা সম্মুখের ক্ষেতে গিয়ে এক চাষীর কাছ থেকে শালগম চেয়ে কাঁচাই খেলেন। তারপর পানীয় জল চাইতে—ধূলিধূসরিত বৃদ্ধের প্রতি উপেক্ষার সুরে চাষী বলল—"নদীতে

গিয়ে জল খাও।" ক্লান্ত রাজার নদী পর্যন্ত হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। কাঁচা শালগম খেয়ে তাঁর খুব কষ্টও হচ্ছিল। তিনি কোনরকমে সামনের নালার ঘোলা জল পান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাদ্য বিষাক্ত হয়ে গেল। তিনি রাজপথের উপর পড়ে ছটফট করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন মহাকোশলের পুত্র, কোশলের অধীশ্বর, বুদ্ধের স্রোতাপন্ন শিষ্য আজ রাজপথে ধূলি-শয্যায় শুয়ে আছেন। হায় কর্মফল!

এদিকে রাজগৃহের মন্ত্রীরা কোশলরাজকে উদ্যানে না পেয়ে সেই চাষীকে প্রশ্ন করলেন। সে বলল—"রাজা কি না জানি না। এক বৃদ্ধ এসে আমার কাছে শালগম চেয়ে খেয়েছিল। তারপর ঐ নালায় জল খেতে গেল।"

মন্ত্রীরা গিয়ে দেখেন, কোশলরাজের প্রাণহীন দেহ রাজপথে পড়ে আছে। অজাতশত্রু সব শুনে বললেন—"রাজচক্রবর্তীর সম্মান দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন কর।"

নিশান উড়িয়ে, দুন্দুভি বাজিয়ে পুষ্পবৃষ্টিতে সব দিক সুরভিত করে মহাসমারোহে কোশলরাজের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হলো।

* * *

ওদিকে বিরূধককে সংযত করবার আর কেউ রইলো না। দিনে দিনে তার স্বেচ্ছাচার বেড়েই চলল। শোনা গেল বিরূধক কপিলবাস্তু ধ্বংসের আয়োজন করছেন। বুদ্ধ ধ্যানে দেখলেন—বিরূধক আর মার এক হয়ে গেছে। একদা উরুবিল্বে তপস্যার সময় মার যেমন তাঁকে ক্রুদ্ধমুখ দেখিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো আজ আবার সেই মারকে দেখতে পেলেন। সে জেগে উঠেছে। ছুটে আসছে তার বাহিনী—যত পাপ, যত জ্বালা, যত মালিন্য আছে তাই নিয়ে, আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করে, পৃথিবীর যত হাসি আনন্দকে ম্লান করে, আকাশের আলোকে কালো করে দিয়ে সে আসছে। তার মুখে উল্কার আগুন ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে—

তার হাতে রক্তমাখা তরোয়াল—তার গলায় আগুনের মালা। তার অশ্বের খুরে বিদ্যুৎবহ্নি। মাররূপী বিরূধক চলেছেন বাহিনী নিয়ে কপিলবাস্তুতে। বুদ্ধ এসে সেই পথে এক পত্রহীন তরুর তলায় বসলেন। বিরূধক তাঁকে দেখে অশ্ব থেকে নেমে প্রণাম করে বললেন—"ভগবন্, এই ছায়াহীন তরুর তলায় কেন বসে আছেন?"

বুদ্ধ বললেন—"বৎস, আত্মীয়রাই তো ছায়া, পত্র, পুষ্প ফল।"

বিরূধক কথাটির তাৎপর্য বুঝে ফিরে গেলেন। বারবার তিনবার বিরূধককে ফেরালেন তিনি। শেষ বার বিরূধকের মন্ত্রী অম্বরীষ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—"ঐ বুদ্ধের কথা শুনলে তোমার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। এবার আমরা উত্তর দ্বার দিয়ে না গিয়ে, নগরীর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে ঘুরে যাব। তুমি বুঝতে পারছ না, কপিলবাস্তু অধিকার করলে আমরা কত শস্যক্ষেত্র পাব, কত মূল্যবান কাষ্ঠ পাব, হাতী পাব, ঘোড়া পাব।" একটু মুচকি হেসে বললেন—"আর পাব সুন্দরী শাক্য রমণীদের।"

এই কথায় বিরূধক সম্মত হলেন। মধ্য রাত্রে নগরীর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে নিঃশব্দে তাঁর বাহিনী যাত্রা শুরু করল কপিলবাস্তুর দিকে। বুদ্ধ শাক্যদের বলে পাঠালেন, "তোমরা যুদ্ধ করবে, কিন্তু নরহত্যা করবে না। এবার হোক পৃথিবীর প্রথম অহিংস যুদ্ধ। তোমরা কোশল সৈন্যদের ধনুকের ছিলা কেটে দেবে। তরবারি ভেঙে দেবে। বর্শার অগ্রভাগ টুকরো করে দেবে।"

তাই হলো। শাক্যরা একটিও নরহত্যা না করে কোশল সৈন্যদের পরাস্ত করলো শুধু অস্ত্র ভগ্ন করে। তারপরই তারা নগরদ্বার রুদ্ধ করে দিল। উপায়?

অম্বরীষ বললেন—"ধৈর্য ধর। আমরা উপান্তে অবস্থান করব। নগরদ্বার কতদিন বন্ধ থাকবে? এক মাস? দুই মাস? তিন মাস? তারপর খুলতেই হবে খাদ্যের জন্য। তখন আমরা

বণিকের ছদ্মবেশে নগরীতে প্রবেশ করে উৎকোচ ছড়িয়ে শাক্যদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করব।"

তাই হলো। মাস তিনেক পরে নগরদ্বার খোলা হলো। শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহের দল চলাচল চুরু করল। অম্বরীষ ও তার অনুচরেরা বণিকের বেশে নগরীতে প্রবেশ করে শাক্যদের মধ্যে অর্থ ছড়িয়ে ভেদ সৃষ্টি করলে। তারপর সময় বুঝে সার্থবাহদের দলে মিশে সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করল।

শুরু হলো অসম যুদ্ধ। কারণ শাক্যরা অপ্রস্তুত। তাদের রক্তে রাজপথ ভেসে যেতে লাগলো। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মহানাম এসে দৌহিত্রের কাছে করজোড়ে বললেন—"আমি পুণ্ডরীক সরোবরে স্নান করতে যাচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে যে সব শাক্য কপিলবাস্তু ত্যাগ করতে চান তাদের ছেড়ে দাও।"

বিরূধক সম্মত হলেন।

মহানাম সরোবরের জলে নামলেন। শাক্যদের মধ্যে ঘোষণা করা হলো—"তোমরা এই অবসরে কপিলবাস্তু ত্যাগ করে যাও।"

কিন্তু শাক্যরা ছিল এত বিষয়ী যে তারা এক দ্বার দিয়ে বেরিয়ে অন্য দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে লাগল। ওদিকে মহানাম জলের মধ্যে নামতে নামতে পুষ্করিণীর উপর ঝুঁকে পড়া একটি বটগাছের ঝুরিতে পা জড়িয়ে ফেললেন। সেই বটগাছের ঝুরি ক্রমে তাঁকে টেনে অতলে তলিয়ে দিল। শুরু হলো আবার নরহত্যা।

তিন দিন তিন রাত ধরে চলল হত্যালীলা। কপিলবাস্তু শ্মশানে পরিণত হলো। গৃহগুলি ভগ্ন। কোথাও বা ভস্মীভূত। শ্মশানশৃগাল, শ্মশানকুকুর পথে পথে ঘুরছে।

অম্বরীষ এসে বললেন—"সমস্ত শস্য লুণ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত সুন্দরী শাক্য যুবতীকে বন্দিনী করে কোশলে পাঠানো হয়েছে। অশ্ব হস্তী রথ অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কপিলবাস্তুতে কিছু

বুদ্ধ ও শিশু ভিন্ন কেউ নেই। মহারাজ, এবার শ্রাবস্তী ফিরে যেতে পারেন।"

সব শুনে বুদ্ধ বললেন—"শাক্যরা তাদের কর্মফল পেয়েছে।"

*　　　*　　　*

বিরূধক নগরে প্রবেশ করে প্রথমে গেলেন কুমার জেতের ভবনে। জেত তখন অলিন্দে বসে বীণা বাজাচ্ছিলেন। বিরূধক তাঁকে দম্ভভরে বললেন—"আমি কপিলবাস্তু ধ্বংস করেছি। শত্রু জয় করেছি।"

জেত একটু হেসে বললেন—"কেই বা শত্রু কেই বা মিত্র? শত্রু জয়ের চেয়ে বড়ো আত্মজয়। আপনি কি তা করছেন?"

বিরূধক গর্জন করে বললেন—"এই কুমার জেত শত্রুদের দলে। একে বধ কর।"

তখুনি তাঁর প্রহরীরা কুমার জেতের বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করল। জেতের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো তাঁর চিরদিনের সঙ্গী বীণাটির উপর।

বিরূধক প্রাসাদে ফিরলেন। প্রাসাদে শাক্য রমণীর দল তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে পরিহাসের হাসি বিরূধকের সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিল। 'দাসীপুত্র', 'দাসীপুত্র' গুঞ্জন ধ্বনি তাঁর কর্ণে বিষ ঢালতে লাগল। তিনি অম্বরীষকে ডেকে আদেশ করলেন—"শাক্য রমণীদের হস্ত-পদ কর্তন করে কণ্টক বনের শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ কর।"

বুদ্ধ যখন এ সংবাদ শুনলেন, তিনি অগ্নিগর্ভ হয়ে বললেন—"বিরূধক সাত দিনের মধ্যে নরকাগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে।"

এরপর তিনি কিছু শিষ্য নিয়ে শাক্য রমণীদের শুশ্রূষায় গেলেন। তাদের ক্ষত স্থানে চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হলো। শুভ্র কার্পাস বস্ত্রে ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া হলো। তাদের মুখে নিজে দিলেন শীতল জল। তারপর দিলেন অন্তিম উপদেশ।

"বৎসে, তোমরা এপার থেকে ওপারে চলে যাও। জীবন থেকে মহাজীবনে যাও। ক্ষতি যত—ক্ষত যত সব মিথ্যা। এই দেহ সমুদ্র-ফেনার মত নশ্বর। সব অনিত্য। এখানে যা ফেলে যাচ্ছ তার জন্য কোন দুঃখ নেই।"

তারা সবাই শান্ত হয়ে আসছিল। মৃত্যু তাদের গ্রাস করছিল। রাণী ক্ষেমা বললেন—"ভগিনীরা, বল বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

দীর্ঘশ্বাসের মত প্রতিধ্বনি উঠলো—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। বুদ্ধং শরণং। বুদ্ধং······

* * *

বিরুধক যখন শুনলেন শাস্তার অভিশাপের কথা, ভয়ে তিনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন। কিন্তু অম্বরীষ অট্টহাস্য করলেন। বললেন—"বন্ধু, ভয় পাচ্ছ? ঐ বৃদ্ধ অনেক যাদু জানে। কিন্তু আমিও জানি। ইন্দীবর সরোবরে যে জলটুঙ্গী আছে তুমি এই সাত দিন সেখানে থাক।" রাজা, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র সকলে জলটুঙ্গীতে আশ্রয় নিলেন। কোশলের রাজকার্য সেখান থেকে হতে লাগল। দিবসের মধ্যাহ্ন গত। সবাই খুশি। বুদ্ধের অভিশাপ ব্যর্থ হতে চলেছে। হঠাৎ যে ঘরে বিরুধক শুয়েছিলেন তার মনুষ্যপ্রমাণ মুকুরে প্রচণ্ড এক ঝলক সূর্য রশ্মি পড়ে আগুন জ্বলে উঠল। গরমে ও ধূমে নিদ্রা ভেঙে গেল। বিরুধক সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"অম্বরীষ, অম্বরীষ।" অম্বরীষের আর্তকণ্ঠ শোনা গেল—"মহারাজ, দ্বার খুঁজে পাচ্ছি না। এত ধূম—এত জ্বালা।" বলতে না বলতে মড় মড় শব্দে কাঠের ছাদ ধ্বসে পড়লো। সরোবরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, রাণীরা, মন্ত্রীবর্গ, পারিষদের দল। অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়ে রইলো শুধু দুটি প্রাণহীন দেহ। রাজা বিরুধক ও মন্ত্রী অম্বরীষ। চারিদিকে অরাজক অবস্থা। কপিলবাস্তু যেমন শ্মশান হয়ে গিয়েছিল—শ্রাবস্তীও তেমনি

হলো। নাগরিকেরা পলায়ন করতে লাগল। রাজপথ জনহীন। মধ্যাহ্নেই মনে হয় মধ্য রাত্রি।

* * *

জীবক এসে বললেন—

"ভদন্ত, শ্রাবস্তীতে আর শান্তি কই? রাজগৃহে চলুন। অজাতশত্রু এখন অনুতপ্ত। মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত তাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছে। দেবদত্ত ও বিরূধকের পরিণতি দেখে তিনি ভয়ার্ত। তিনি চাইছেন আপনি রাজগৃহে ফিরে আসুন। উপদেশ দিন। রাজগৃহে আপনার উদ্যোগ প্রথম শুরু হয়েছিল। বিম্বিসার, অভয়, সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন, রাণী ক্ষেমা, আমি—সকলেই রাজগৃহবাসী।"

বুদ্ধের চোখে ছায়া ঘনিয়ে এল। তিনি বললেন—"জীবক, কোশলের পতনে মগধের শক্তি বৃদ্ধি। উত্তর ভারতে মগধের তুল্য শক্তি আর কার আছে? এক বৈশালী। অজাতশত্রু শীঘ্রই বৈশালী আক্রমণ করবেন।"

তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"বৈশালীতে ঐক্য যতদিন থাকবে ততদিন তাকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।"

জীবক দেখেছিলেন বুদ্ধের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। বয়স তো প্রায় আঠাত্তর হলো। জীবক বললেন—"এবার গেলে আপনাকে আর গৃধ্রকূটে থাকতে দেব না। গৃধ্রকূটের তলে আমার আম্রকাননে আপনি থাকবেন। এই কানন আপনাকে নিবেদন করছি—এ আমার বহুদিনে সংকল্প।"

জীবক দানপত্র বুদ্ধের চরণতলে রাখলেন। বললেন—"গ্রীষ্মাবাসের পক্ষে পক্ষে স্থানটি মনোরম—ছায়াশীতল, নির্জন, শান্তিময়।"

বুদ্ধ বললেন—"যখন তরুণ ছিলাম, পিতা আমাকে দিয়েছিলেন—গ্রীষ্মাবাস, বর্ষাবাস, শীতাবাস। তারপর রাজা

বিম্বিসার দেন বেণুবনবিহার, গৃধ্রকূট। বৈশালীর লিচ্ছবিরা দেন মহাবনে কূটাগারশালা। অনাথপিণ্ডদ দেন শ্রাবস্তীর জেতবন-বিহার। বিশাখা দেন শ্রাবস্তীর পূর্বারাম বিহার। কৌশাম্বীপতি উদয়ন দেন শিংশপাবনে ঘোষিতারাম বিহার। এখন তুমি দিচ্ছ তোমার আম্রকানন। দেখ—আমার ভূমিলাভের সীমা নেই।" বলে প্রসন্ন হাসি হাসলেন। তাঁর যুগ্ম ভুরুর মধ্যকার সাদা কেশগুচ্ছ একটি শুভ্র ফুলের মত দেখাচ্ছে। আর হাসিটি কি স্বর্গীয়। জরা মানুষকে এত সুন্দর করতে পারে!

জীবক নির্নিমেষে বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তথাগত বললেন—"বৎস, তোমার আম্রকাননেই আমি এই গ্রীষ্ম কাটাব।"

বুদ্ধ রাজগৃহে এলেন। প্রভাতে উপদেশ দিচ্ছেন, সম্মুখে দ্বাদশশত ভিক্ষু। কাশ্যপ সামনে বসে উপদেশ লিখছেন। এমন সময় সারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রন্দন করতে করতে বুদ্ধের চরণে এসে পড়লেন।

তাঁর হাতে সারিপুত্রের ভিক্ষাপাত্র। ভিক্ষাপাত্রে তাঁর চীবর। সারিপুত্রের নির্বাণ লাভ হয়েছে। এই তো মাত্র এক মাস পূর্বে সারিপুত্র অসুস্থতার জন্য মায়ের কাছে নালন্দা গ্রামে গিয়েছিলেন। অসম্ভব পরিশ্রমে তাঁর যক্ষ্মা হয়েছিল। মা সুরূপসারি মাথায় করাঘাত করে বলেছিলেন—"কোন অর্থ উপার্জন না করে যাদের জন্য সারাজীবন পাত করলে শেষ জীবনে তারা তোমাকে দেখলোও না?" চোখের জল মুছতে মুছতে শ্রেষ্ঠ সন্তানটির যথাসম্ভব সেবা করলেন তিনি। কিন্তু কিছু হলো না। যে ঘরে আজ প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন সেই ঘরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বুদ্ধ সব শুনলেন। তারপর সারিপুত্রের ভিক্ষাপাত্র ও চীবর তুলে সমবেত ভিক্ষু সংঘকে বললেন—

"হে ভিক্ষুগণ, দেখ, মহাজ্ঞানী মহাধ্যানী ধর্মসেনাপতি আমার

দক্ষিণহস্ত অগ্রশ্রাবক সারিপত্রের পৃথিবীতে এই এই সম্বল ছিল। দেখ, মানব জীবন কত অনিত্য। সারিপুত্রের মধ্যে অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। অথচ তাঁর জ্ঞানের পরিসীমা ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—দুই ধর্মেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল গভীর।

অল্পই লোক দেখা যায় এই আঁধার জগত 'পরে,
অল্পই লোক জালছেঁড়া পাখি, স্বর্গে গমন করে।

সারিপুত্র ছিলেন এই অল্প লোকের একজন। জালমুক্ত পাখি। দেখছি তিনি আদিত্য পথে চলেছেন।

আদিত্য পথে উড়ে যায় হাঁস, যায় সে ঋদ্ধিমান
মারে পরাভবি সংসার হতে ধীরজন চলে যান।"

সারিপুত্রের মৃত্যু সঙ্ঘকে যে প্রচণ্ড আঘাত হানলো তা দেবদত্তের বিদ্রোহও আনে নি।

আজীবকেরা চিরকালই বৌদ্ধদের শত্রু ছিল। সারিপুত্রের নির্বাণের মাত্র পনের দিন পরে তারা মোগ্‌গলায়নকে প্রচণ্ড প্রহার করে, তাঁর প্রতিটি অস্থি ভেঙে মাংসপিণ্ডে পরিণত করলো। বুদ্ধ ঋষিগিরি পর্বতে গেলেন তাঁকে দেখতে। মোগ্‌গলায়নের প্রাণ তখনো ছিল। তিনি বুদ্ধের পায়ে গড়িয়ে পড়লেন। চোখে জল। একটু পরেই মহাশ্রাবকের দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বুদ্ধ বললেন—"মোগ্‌গলায়ন ছিলেন আমার বামহস্ত অগ্রশ্রাবক। তিনি ছিলেন মারজিৎ—লোকজিৎ—অর্হৎ।"

মোগ্‌গলায়নের প্রয়াণের কথা শুনে রাজগৃহের বহু লোক 'হায় হায়' করতে লাগল। তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কার কন্যাদায়, কার পুত্রের শিক্ষা দরকার, কোন্ রোগীর সেবা চাই, কার অন্ন চাই', কার বস্ত্র চাই, সেইদিকে তাঁর খরদৃষ্টি ছিল। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়-বুদ্ধের এই বাণী তাঁর মধ্যে রূপ নিয়েছিল। সাতদিন ধরে বিরাট সমারোহে মোগ্‌গলায়নের

অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হলো। তারপর বেণুবনবিহারের দ্বারে একটি স্তূপ নির্মিত হলো। তাতে শ্রেষ্ঠীদের দেওয়া বৈদূর্য, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি খচিত হলো।

এদিকে অজাতশত্রুর মনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। রাত্রে ঘুমোতে পারেন না। দিনে খেতে পারেন না। জীবক তাঁকে নিয়ে সমস্যায় পড়লেন। পিতৃহত্যার অপরাধ রাজা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

এক অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রে প্রাসাদের ছাদে রাজা অজাতশত্রু অর্ধশায়িত। রাণী নায়কী পা টিপছেন। মন্ত্রীরা আছেন। জীবকও আছেন। অজাতশত্রু বললেন—"মনটা অস্থির অস্থির করছে।" অমনি মন্ত্রীরা যে যাঁর গুরুর গণকীর্তন শুরু করলেন এবং নিজ নিজ গুরু সকাশে রাজাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। জীবক চুপ।

অজাতশত্রু বললেন—"মিত্র জীবক, তুমি কেন চুপ করে আছ?" জীবক বললেন—"মহারাজ, আমি তো বলেইছি আপনি তথাগতের কাছে উপদেশ শুনুন—শান্তি পাবেন।" অজাতশত্রু বললেন—"এখনি চল।" দুজনে রথে চড়ে জীবকাম্রবনে চললেন। পথ জনহীন। আম্রকাননে প্রবেশ করে দেখলেন বহু লোক। অজাতশত্রুর মনে হলো এরা বৃজির বাহিনী। তাঁর রাজ্যে লুকিয়ে আছে—অতর্কিতে আক্রমণ করবে বলে। তাঁর রীতিমতো ভয় করতে লাগল। কে জানে জীবক বৃজির চর কিনা! অজাতশত্রু বললেন—"একটিও শব্দ শোনা যাচ্ছে না—অথচ এত লোক! জীবক, তুমি কি আমাকে শত্রুশিবিরে আনলে নাকি?" জীবক রাজার মনোভাব বুঝে হেসে বললেন—"এঁরা কেউ বৃজির অনুচর নয়। সবাই বুদ্ধশিষ্য। সকলে ধ্যান করছেন। এই বুদ্ধের শিক্ষা।" ধ্যান শেষ হলে জীবক গিয়ে বুদ্ধকে রাজার আগমন বার্তা শোনালেন। বুদ্ধ বললেন—"সুস্বাগতম্।" অজাতশত্রু

তাঁকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন—"আশীর্বাদ করুন আমার পুত্র উদয়ী যেন তৃষ্ণামুক্ত হয়।"

বুদ্ধ বললেন—"উদয়ী আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র। তাঁর কল্যাণ হোক এই আশীর্বাদ আমি নিত্য করি।"

এর পর অজাতশত্রু একটি মূল্যবান্ প্রশ্ন করলেন। তার উত্তর বৌদ্ধ শাস্ত্রে "শ্রামাণ্য ফল সুক্ত" বলে খ্যাত। তিনি প্রশ্ন করলেন—"শ্রমণ হলে কি ফল পাওয়া যায়?" বুদ্ধ বললেন—"প্রথমত, কেউ যদি সন্ন্যাস নেয় সে রাজাই হোক আর ক্রীতদাসই হোক লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমণ যদি স্রোতাপন্ন হয় তবে সে আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে আগে থেকেই সতর্ক হতে পারে। অপরকেও সতর্ক করে দিতে পারে।

তৃতীয়ত, সে হয় ভয়শূন্য, উদ্বেগশূন্য, তৃষ্ণাশূন্য।

চতুর্থত, সে লাভ করে অমেয় শান্তি, এক আনন্দময় জীবন।"

এবার অজাতশত্রু বুদ্ধকে নিভৃত স্থানে নিয়ে এসে বললেন—"শীঘ্রই আমরা বৈশালী আক্রমণ করবো। কৃষির জন্য গঙ্গার জল বৃজিরা দিচ্ছে না। তারা বাঁধ তৈরী করে বেশী জল নিয়ে নিচ্ছে।"

বুদ্ধ বললেন—"যুদ্ধ করলে কোন ফল হয় না। রোহিনী নদীর জল নিয়ে কোলিয় এবং লিচ্ছবিদের যে কলহ বেধেছিল আমি আলোচনার দ্বারা তার সমাধান করেছিলাম। তোমরাও তাই কর।"

অজাতশত্রু বললেন—"আপনি যদি বৃজিদের বলে কলহ মিটিয়ে দিতে পারেন তো দিন। নাহলে মগধ যুদ্ধ করবেই।"

বুদ্ধ বললেন—"আমি কালই বৈশালী যাব।"

* * *

পরদিন অতি প্রত্যূষে তিনি গৃধ্রকূটে উঠলেন। পায়চারি করতে করতে রাজগৃহের চতুর্দিক তাকালেন। পূর্বে দেখলেন,

রাজপ্রাসাদে বিম্বিসার নেই। দূরে নালন্দার দিকে তাকালেন, সারিপুত্র নেই। ঋষিগিরির দিকে তাকালেন, মোগ্গলায়ন নেই। শ্রাবস্তীতে প্রসেনজিৎ নেই। রাহুল নেই; রাহুলমাতা নেই; মহাপ্রজাবতী নেই। চারিদিক শূন্য। তবে আর কেন?

তিনি আনন্দকে বললেন—"বৈশালী চল। কাজ আছে।" আনন্দকে নিয়ে তিনি পাটলীগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা যরলেন। পাটলীগ্রামে পেঁছে দেখলেন গঙ্গা-শ্যেন সঙ্গমে শুরু হয়েছে দুর্গ নির্মাণ। স্বয়ং মন্ত্রী বর্ষকার তত্ত্বাবধান করছেন। সঙ্গে আছেন স্থপতি সুনিপুন। বুদ্ধ দেখলেন—হৈ চৈ চলছে। কি ব্যাপার? বৃজির গুপ্তচর ধরা পড়েছে। সে নাকি কূপের জলে বিষ মেশাচ্ছিল মগধ বাহিনীকে সমূলে নিধন করবার জন্য। বৃজির লোকটি ভয়ে কম্পমান। বর্ষকার হুঙ্কার দিচ্ছেন—"গুপ্তচরকে শূলে দাও।"

বুদ্ধ বললেন—"বর্ষকার, একে ছেড়ে দাও। আমার শূলদণ্ড হোক।"

বর্ষকার হতবাক। লজ্জিত হয়ে বুদ্ধকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। ঠিক হলো বৃজির চর বুদ্ধের সঙ্গে বৈশালী যাবে।

দুর্গ দেখে বুদ্ধ খুব খুশি হয়ে বললেন—"আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এক বিশাল নগরী হবে। পাটলী আর গ্রাম থাকবে না। হবে মগধের রাজধানী। স্থানটির মাহাত্ম্য আছে। শুনছ না পাখির গান? গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি? সাতরঙা প্রজাপতি উড়ছে। সূর্যকিরণ পরীর মত নৃত্য করছে।"

এমন সময় জীবক এসে উপস্থিত। বর্ষকার তাঁর দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকালেন। বর্ষকারের মতে জীবক বৃজির চর। কেননা তিনিও বুদ্ধের মত বৈশালীর সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধী। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বুদ্ধ চললেন গঙ্গাদ্বারে।

গঙ্গাদ্বারে পেঁছে সদলে নৌকোয় উঠলেন বিনাশুল্কে। প্রায়

চল্লিশ বছর আগে উরুবিল্ব থেকে ঋষিপত্তনে যাবার সময় শুল্ক না দিতে পারার জন্য শ্রমণ গৌতমকে অনেক ঝঞ্চাটে পড়তে হয়েছিল। বিম্বিসার এ কথা শুনে শ্রমণ, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুদের শুল্কগ্রহণ বন্ধ করে দেন। জীবক বুদ্ধ, আনন্দ, বৃজির চর এবং আরো দুজন শ্রমণকে নৌকোয় তুলে দিলেন। যতদূর পর্যন্ত নৌকাটি দিগন্তে না মিলিয়ে যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বুদ্ধের পীতবর্ণ উত্তরীয় উজ্জ্বল শিখার মত বহুদূর পর্যন্ত দেখা গেল। তারপর বিন্দু হলো। তারপর মিলিয়ে গেল। জীবকের মনে হলো তাঁর জীবনে যেটুকু আলো ছিল তা নিবে গেল।

ভগ্নহৃদয়ে জীবক রাজগৃহে ফিরলেন। কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন শুভা। জীবকের চোখে জল দেখে সে নীরবে নতমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর প্রশ্ন করল—"আপনি এখন কি করবেন?"

জীবক চোখের জল মুছে বললেন—"ভাবছি, একটি আরোগ্য-শালা নির্মাণ করব। আমার যে-টুক সঞ্চয় আছে"......

"আমাকে তাতে সেবিকা হবার অনুমতি দিন। আমার যা অলঙ্কার আছে তা দেব অর্থ সাহায্যে।' জীবকের মুখ প্রসন্ন হলো। মুখে বললেন—"উত্তম প্রস্তাব। শাস্তা বলেন, সেবা দশ কুশল-কর্মের একটি।"

শুভা হয়তো আরো কিছু শুনবে আশা করেছিল।

*   *   *

বুদ্ধ বৈশালী পৌঁছে উঠলেন আম্রপালির আম্রকাননে। আম্রপালি থাকতেন বৈশালীর অদূরে কোটি-গ্রামে। এইখানে ছিল তাঁর বিশাল প্রাসাদ। অভয়ের পত্রে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন, তথাগত আসছেন। তবু তিনি বুদ্ধ তাঁর গৃহে এসেছেন শুনে অত্যন্ত অভিভূত। কি করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবেন?

রূপসী নটিমুখ্যাকে দেখে শিষ্যদের মনে চাঞ্চল্য যেন না হয় তার জন্য বুদ্ধ উপদেশ দিলেন। 'সপ্তসম্প্রজ্ঞান' বলে এটি ভিক্ষুদের মধ্যে প্রখ্যাত। সম্যক চিন্তা কি এই নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর একটি পদ বললেন—

"বাসনাবিহীন চিত্ত যাঁহার জ্ঞানালোক হৃদে জ্বলে
নির্বাণমুখী সেই মহাজনে ঊর্ধ্বস্রোতাই বলে।"

আনন্দ বললেন, "ভদন্ত, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমাদের কেমন ব্যবহার করতে হবে?"

বুদ্ধ—"স্ত্রীলোকদের চোখের দিকে তাকিয়ো না।"

আনন্দ—"যদি তাকাতে হয় তবে কি করব?"

বুদ্ধ—"যদি তাকাও—তাহলে কথা বল না।"

আনন্দ—"যদি কথা বলতেই হয় তাহলে কি করব?"

বুদ্ধ—"কথা বলতে হলে হৃদয় চাঞ্চল্যকে দমন করে সতর্ক হয়ে কথা বলবে।"

আম্রপালি এলেন এক ষোল ঘোড়াটানা বিচিত্র রথে। বুদ্ধের চরণে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে উপদেশ চাইলেন। রূপবতী আম্রপালিকে বুদ্ধ বোঝালেন রূপ অসার। "তোমার এই সুন্দর দেহ, এই যৌবন একদিন অতীত হবেই। জরা আসবেই। মানুষের দেহ কেমন জানো? কুম্ভকারের তৈরি মৃত্তিকা পাত্র—একটু আঘাতেই ভেঙে যায়। একদিন চুল সাদা হয়ে যাবে, মুখ হবে দন্তহীন, শক্তি থাকবে না। সুরকে মনে হবে বেসুর। রসকে মনে হবে নীরস। কারো নিস্তার নেই তার হাত থেকে। সে সব শুকিয়ে দেবে, শুষে নেবে, লুটে নেবে। আলো থেকে অন্ধকারে তার যাত্রা—বৎসে। কিন্তু যদি তুমি আর্য সত্যের শরণ নাও তাহলে এই দুঃখ তুমি জয় করতে পারবে।

রাজরথ যথা জীর্ণতা পায় হলেও সুচিত্রিত,
সেই মতো হয় মানুষের দেহ জরাভারে নিপীড়িত।

এই দেহ, হায়, মরীচিকা প্রায়, ফেন সম যায় ভাসি
জাগাও এ বোধ, মৃত্যু এড়াও পঞ্চশরেরে নাশি।"

আম্রপালি প্রণাম করে বুদ্ধকে পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ সম্মতি দিলেন।

এবার দলে দলে লিচ্ছবি নায়কেরা এলেন। বিরাট সভা বসল। বুদ্ধ তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন মগধের সঙ্গে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। মগধের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশালীর কর্তব্য তাদের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা গঙ্গার জল ভাগ করা। লিচ্ছবি নায়ক সিংহ বললেন—"জল ভাগ তো বড় কথা নয়। বড় কথা গঙ্গার তীরে একটি মূল্যবান ধাতুর খনির সন্ধান মিলেছে। সেই ধাতু রূপোর মত শুভ্র, সোনার চাইতেও মূল্যবান। এই খনিটি অজাতশত্রু চাইছেন।"

বুদ্ধ বিস্মিত। এ খবর তো তাঁকে অজাতশত্রু বলেন নি। তবু তিনি বললেন—"খনির ধাতু কি সম ভাগে ভাগ করা যায় না?"

সিংহ বললেন—"না।"

বুদ্ধ শেষ চেষ্টা করলেন।

"মানুষের প্রাণ কি ধাতুর চেয়ে বেশী মূল্যবান নয়? আমি বৈশালীকে ভালবাসি। স্বর্গ যদি পৃথিবীতে কোথাও থাকে তবে তা এই বৈশালী। আমি চাই না শ্রাবস্তীর মতো বৈশালীও ধ্বংস হয়ে যাক। বৈশালীর উচিত হবে না মগধের সঙ্গে যুদ্ধ করা। অজাতশত্রু দুটি নতুন অস্ত্র নির্মাণ করেছেন। বৃহৎশিলা-কণ্টক ও রথমুষল। এই দুটি নতুন অস্ত্র তিনি এবারের যুদ্ধে ব্যবহার করবেন।"

কিন্তু লিচ্ছবিরা চুপ করে রইলেন। বুদ্ধকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কথায় লিচ্ছবিরা সম্মত নন। তারপর অদ্ভুত একটি কাণ্ড হলো। লিচ্ছবিরা বুদ্ধকে শত শত উত্তরীয় উপহার দিতে লাগলেন। এত উত্তরীয় দেওয়া হলো যে সেখানে সমবেত সব

শিষ্যরা তো উত্তরীয় পেলই, তবু বেশী হলো। আসলে লিচ্ছবিরা অজাতশত্রুর প্রস্তাব শুনতে রাজি না হলেও বুদ্ধকে সম্মান দিলেন।

লিচ্ছবিনায়ক সিংহ বুদ্ধকে পরদিন ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ বললেন—"কাল আমাকে আম্রপালি নিমন্ত্রণ করে গেছে—আমি সেখানে যাব।"

সিংহ বিস্মিত। আম্রপালি নটী ; সামান্যা রমণী ; লিচ্ছবিদের প্রজা মাত্র। বুদ্ধ সেখানে খাবেন ? এক জনপদবধূকে এত সম্মান দেবেন ? সিংহ তখুনি গিয়ে আম্রপালিকে বললেন—"তুমি নিমন্ত্রণ তুলে নাও। আমি এ জন্য তোমাকে দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দেব।"

আম্রপালি বললেন—"তা হয় না। আপনি আমাকে বৈশালীর সমগ্র রাজকোষ দিলেও আমি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করব না।"

সিংহ বললেন—"এতদূর !!!"

তিনি ফিরে গেলেন।

পরদিন বুদ্ধ আম্রপালির ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। আহারান্তে আম্রপালি বললেন—"আমার এই ভবন সংঘ গ্রহণ করলে আমি ধন্য হবো। এখানে ভিক্ষুদের বিহার হোক। আমার যে অলঙ্কার আছে তার মূল্য প্রায় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। তা বিহার-বাসীদের খরচ জোগাক। আমি পতিতা। আপনি কি আমাকে দীক্ষা দেবেন, প্রভু ?"

বুদ্ধ বললেন—"বৎসে, দীক্ষা দেব। নিজেকে এত হীন মনে করছ কেন ? পঙ্কে পদ্মের জন্ম হলেও সে মধুর সৌরভ বিতরণ করে।

মোহে আবদ্ধ মানুষ যেমন আবর্জনার রাশি,
বুদ্ধশিষ্যা পদ্মের মত উঠে তাতে উদ্ভাসি।"

বুদ্ধ দীক্ষা দিলেন।

এর বহু বছর পরে। তখন তথাগতের নির্বাণ লাভ হয়েছে। থেরী আম্রপালি জরার উপর একটি সুন্দর গাথা আর্যা ও জগতী ছন্দের মিশ্রণে লিখেছিলেন।

"ভ্রমরের মতো কালো ছিল কেশ বর্ণে,
কুঞ্চিত ছিল বেণী পর্ণে ;
আজিকে জরায় মাথা শনের মতন সাদা,
প্রভুর বচন জাগে মর্মে।
সোনার শাঁখের মত ছিল যার শোভা গো,
এই কি আমার সেই গ্রীবা গো ?
জরায় গিয়েছে ভেঙে,
ঢলিয়া পড়েছে নেমে।
এ দেহের গৌরব কিবা গো !!
বাহু দুটি ছিল যেন বর্তুল অর্গল ;
এখন হয়েছে নত, দুর্বল।
জরাবশে হলো বাঁকা,
যেন পাটলীর শাঁখা।
হায়রে জীবের বল-সম্বল !!!"

* * *

বুদ্ধ বৈশালীর প্রান্তে বেলুবা গ্রামে গিয়ে শেষ বর্ষা যাপন করলেন। এখানে তিনি মৃত্যুতুল্য অসুখে পড়লেন। একটু সুস্থ হয়ে ভাদ্রের শেষে কুশীনারার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি ভেবেছিলেন কুশীনারার মল্লরাজেরা লিচ্ছবিদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। শুধু একবার পিছন ফিরে অস্তসূর্যের আলোয় মর্ত্যের স্বর্গ বৈশালীকে শেষ দেখা দেখে নিলেন।

তারপয় গেলেন পাভা গ্রামে। সেখানে শিষ্য চুন্দ কর্মকারের আম্রকাননে উঠলেন। চুন্দ তাঁকে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ করলে বুদ্ধ তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভোজনের সময় যেই

তিনি চুন্দের হাত থেকে থালাটি নিতে যাবেন উপবাণ বলে এক শ্রমণ থালাটি কেড়ে খেতে শুরু করে দিল। সবাই হতবাক। চুন্দ ছুটে গেল রন্ধনশালায়। কিছুই অবশিষ্ট নেই। উপবাণ পিছনে পিছনে এসে বলল—"ঐ তো শূকরকন্দের (খাম আলু) ব্যঞ্জন আছে। তাই দাও।"

নির্বোধ চুন্দ কিছু না বুঝে তাই এনে প্রভুকে খেতে দিল। বুদ্ধ খেয়েই পেলেন বিকৃত স্বাদ। বুঝলেন, বিষযুক্ত খাদ্য দেওয়া হয়েছে। দেখলেন উপবাণের মুখে ক্রূর হাসি। বুঝলেন, সে বৃজির চর। তিনি যে মল্লভূমিতে চলেছেন যুদ্ধ বন্ধ করতে, বৃজি তা চায় না।

শেষ রাত্রে বুদ্ধের অতিসার রোগ শুরু হলো। কুণ্ঠিত চুন্দকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন—"তোমার কোন দোষ নেই। উরুবিল্বে সুজাতার পায়েসান্ন খেয়ে আমার যেমন ভাল লেগেছিল, কাল তোমার ব্যঞ্জন খেয়ে আমার তেমনি ভাল লেগেছে। সুজাতার পায়েস খেয়ে আমি মহাজীবন লাভ করেছিলাম। তোমার ব্যঞ্জন আমাকে মহানির্বাণ দেবে।"

বুদ্ধের তখন বয়স অশীতিপর। দেহ অবসন্ন—জরাভারে তথা রোগে। কিন্তু সংকল্প তখনো দৃঢ়। চিত্ত অবিচলিত। ধীরে ধীরে কপিত্থু নদীর তীরে এলেন তিনি। বড় তৃষ্ণা পেল। আনন্দকে একটু জল আনতে বললেন। জল কর্দমাক্ত দেখে আনন্দ বললেন—"আর একটু আগে চলুন, নির্মল জল পাবেন।" কিন্তু তাঁর এত তৃষ্ণা পেয়েছিল যে সেই কর্দমাক্ত জলই পান করলেন। এই সময় তাঁর প্রথম গুরু আড়ার কালামের শিষ্য পুক্কুস বলে এক মল্লের সঙ্গে বুদ্ধের দেখা হলো। সেই অবস্থায় বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দিলেন। পুক্কুস তাঁকে দিলেন একটি সুন্দর বস্ত্র। কপিত্থু নদীর জলে স্নান করে বুদ্ধ একটু সুস্থ বোধ করলেন। নতুন বস্ত্রটি পরলেন। তাঁকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। একটু পথ

চলতেই আবার অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন। ততক্ষণে আনন্দ বুঝতে পেরেছেন বুদ্ধের পরিনির্বাণ আসন্ন। তিনি ভীত হয়ে বললেন—"ভদন্ত, আপনার অন্তিম উপদেশ দেবেন না? সংঘভার কাকে দেবেন?"

বুদ্ধ বললেন—"আমার শেষ উপদেশ 'অত্ত দীপা বিহরথ'। হে আনন্দ, নিজেই নিজের দীপ হও। নিজেই নিজের শরণ লও। অন্যের শরণ নিয়ো না। সত্যের শরণ নাও। সঙ্ঘের ভার তো হাতের মুঠোয় রাখি নি। সবাইকে দিয়েছি। আমি এখন ভেঙে যাওয়া শকট। দিন শেষ। যাত্রা শেষ।"

আনন্দের গলা কান্নায় রুদ্ধ।

"ভদন্ত, আপনার শেষকৃত্য কি ভাবে হবে?" বুদ্ধ বললেন—"তোমাকে ভাবতে হবে না, আনন্দ। আমার গৃহী শিষ্যরাই ভাববে।"

আবার তিনি উঠে বসলেন। অল্প দূরেই শালবন। দুটি শালগাছে অজস্র ফুল ধরেছে। সেইখানে শেষ বারের মত বাহু উপাধান করে শয়ন করলেন তিনি। বললেন—"আনন্দ, একটু জল।" সামনে হিরণ্যবতী নদী ছল ছল করে বয়ে যাচ্ছে। আনন্দ জল আনলেন না। মৃত্যুশয্যাশায়ী বুদ্ধের নিকটেও বসলেন না। দূরে বসে ক্রন্দন করতে করতে বললেন—"যদি মহানির্বাণ লাভ করবেন তাহলে রাজগৃহে করলেন না কেন? অজাতশত্রু আপনাকে রাজচক্রবর্তীর সম্মান দিতেন। কেন চম্পায় গেলেন না? কেনই বা বৈশালীতে থাকলেন না?"

কথাগুলি নিশ্চয় বুদ্ধের প্রাণে শেলের মত বিঁধছিল। অজাতশত্রু পরোক্ষে তাঁকে রাজগৃহ থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। বৈশালীর নায়কেরা তাঁকে বিষ দিয়েছেন। কার কাছে তিনি যাবেন? একদিন লুম্বিনীর উদ্যানে অশোক গাছের তলায় যাঁর জন্ম হয়েছিল আজ এই পুষ্পিত যুগ্মশালতরুর তলে তাঁর শেষ

নিঃশ্বাস পড়লো। শালতরুর থেকে দু চারটে মঞ্জরী দক্ষিণা বাতাসে ঝরে পড়লো তাঁর দেহের উপর। পশ্চিমে রক্তিম মেঘের মধ্যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে তার শেষ গরিমা বিস্তার করে। পূর্ব দিকে উঠছে কার্তিকী শুক্লা অষ্টমীর রূপালী চাঁদ। আকাশে একই সঙ্গে সোনার রেখা রূপোর রেখার আঁচড়। সুরভিত বাতাস বইছে। পুক্কুস এসে দেখল তথাগতের মহাপরিনির্বাণ ঘটেছে। আনন্দ সে কথা শুনে সরবে রোদন করতে লাগলেন।

পুক্কুস ছুটে গেল কুশীনগরের মল্লরাজদের সংবাদ দিতে। পথে যে সব সার্থবাহের দল যাচ্ছিল বৈশালী, রাজগৃহ, সাকেত—তাদের সর্বত্র এই খবর দিয়ে দিতে বললো। মল্লরাজেরা সংবাদ পেয়ে এসে মহানির্বাণগত বুদ্ধকে দেখলেন। অষ্টমীর চাঁদ তাঁর উপর স্নিগ্ধ কিরণ ছড়াচ্ছে। প্রকৃতি তাঁর দেহের উপর শালফুলের অঞ্জলি দিয়ে গেছে। মল্লরাজেরা চাইলেন তক্ষুণি মহাপুরুষের দেহ কুশীনগরে নিয়ে যেতে। কিন্তু শ্রেষ্ঠীরা বললেন—"আমরা সর্বত্র খবর পাঠিয়েছি। সকলেই আসুন।"

অজাতশত্রু এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবককে ডেকে পাঠালেন। বললেন—"শাস্তার জীবিত বা মৃতদেহ রাজগৃহে নিয়ে আসতেই হবে।" অজাতশত্রু হাতিতে উঠতে গেলেন। পড়ে গেলেন। অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে গেলেন। পড়ে গেলেন। বুঝলেন বুদ্ধ তাঁকে পিতৃহত্যার জন্য ক্ষমা করেন নি। বিবর্ণ মুখে বললেন—"জীবক, তুমি যাও, যা ভাল বোঝ কর।"

সাতদিনের দিন পৌঁছিয়ে জীবক দেখলেন—পাভার মল্ল, কুশীনারার মল্ল, বৈশালীর লিচ্ছবি, রামগ্রামের কোলিয়, কপিলবাস্তুর শাক্যরা সৈন্যদল সহ উপস্থিত। সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। জীবক সব দেশের প্রতিনিধিদের ডেকে বললেন—"যিনি অহিংসার পূজক তাঁর দেহ নিয়ে যুদ্ধ করা অনুচিত। তিনি যুদ্ধবিরোধী ছিলেন। কোলিয়দের সঙ্গে লিচ্ছবিদের যুদ্ধ হতে দেন নি।

লিচ্ছবিদের সঙ্গে মগধের যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য তিনি মহাপ্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

আমি বৈদ্য এবং তাঁর গৃহীশিষ্য। সকলকে তাঁর পদনখকণা ও কেশ দেব। এই নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে স্তূপ রচনা করুন।"

কুশীনারার ব্রাহ্মণ দ্রোণ বললেন—"ভিষগরত্ন ঠিক কথাই বলছেন। তথাগত যখন মল্লভূমিতে তাঁর দেহ রেখেছেন, এইখানেই তাঁর শেষকৃত্য হোক। নখ ও কেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভস্মও আপনারা ভাগ করে নিয়ে যান।"

সকল দেশের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। জীবক এঁদের একটু নখ ও চুল কেটে দিলেন। অগ্নিকার্যের পর দ্রোণ ভস্ম অষ্টভাগে ভাগ করলেন।

এই আটটি ভাগ পেলেন—মগধ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, অল্লকপ্পবাসী বুলিরা, রামগ্রামের কোলিয়রা, বেধদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণেরা, পাভার মল্লরা ও কুশীনারার মল্লরা। দ্রোণ নিলেন ভস্মপাত্র। পিপ্পলিবনের মৌর্যেরা নিলেন ভস্মান্ত।

স্বর্ণাধারে ভস্ম সযত্নে বক্ষে নিয়ে জীবক ফিরে চললেন রাজগৃহে।

* * *

এই সেই পথ। যে পথ দিয়ে চল্লিশ বছর আগে তিনি রাজগৃহে বুদ্ধের কাছে প্রথম এসেছিলেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। দূরে কে এক রাতজাগা পাখি ডাকছে। বুনোফুলের মিষ্টি গন্ধ। হেমন্তের হিমেল হাওয়া। বেণুবন বিহারে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারিত হচ্ছে—

"ইহ মোদতি পেচ্চ মোদতি
কত পুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি।……
ওঁ নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো গোতম চন্দিমায়।"

জীবকের মনে হলো তিনিই সূর্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই জীবনের আলো। মহাপরিনির্বাণ তো তাঁর ঘটে নি। তিনি অনির্বাণ। তাঁর ধর্মপদ পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে, দেশকাল অতিক্রম করে, যুগ যুগ ধরে মানুষকে মানুষ করে তুলবে। কানে ভাসছে বিম্বিসারের কণ্ঠ "সত্য ধর্ম শ্রবণ কঠিন—অতি দুর্লভ বুদ্ধ।" কানে ভাসছে বুদ্ধের বাণী—"অষ্টমার্গ চতুঃসত্য সম্যক রূপে জানো।" টুকরো টুকরো কত কথা। কত উপদেশ। মহাকাশ্যপকে বলতে হবে তিনি যেন এক মহাসঙ্গীতি ডাকেন। রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী, সাকেত, কপিলবাস্তু—যেখানে যত বৌদ্ধ আছে এই মহাসম্মেলনে মিলিত হোক। অস্থির চেয়ে বড় শক্তি বুদ্ধের বাণী। সেগুলি সংগৃহীত হোক। সংরক্ষিত হোক। দেহরোগের ভিষগাচার্য ভবরোগের ভিষগাচার্যকে শেষ প্রণাম জানালেন—

"বুদ্ধো বীরো নমোত্যত্থু সব্বসত্তানমুত্তম।
যো মং দুক্খা পমোচেসি
অঞ্ঞেঞ্চ বহুকম জনম্ ॥
সব্ব দুকখং পরিঞ্ঞাতং হেতু তণ্হা বিসোসিতা
অরিয়টঠঙ্গিকোমগ্গো নিরোধোফুসিতো ময়া ॥
বুদ্ধ বীর নমি আমি তুমি সর্বসত্তা শ্রেষ্ঠতম ;
এড়াইল দুঃখ জ্বলা, কত শত দুঃখী মোর সম।
দুঃখের নিদান জানি তৃষ্ণা মোর শুকায়েছে প্রাণে
অষ্টাঙ্গিক শ্রেষ্ঠ মার্গ লভিয়াছি তব দত্ত জ্ঞানে।"

———